এ.বি.সি. মার্ডার

আগাথা ক্রিস্টি

BENGALIEBOOK.COM
BE
বেঙ্গলিইবুক.কম
bengaliebook.com
★2022★

সূচিপত্র

১. ছমাসের জন্য বিশ্রাম..........2

২. মিস বার্নার্ড সম্পর্কে..........38

৩. চিঠি পড়া শেষ..........74

৪. রহস্যের সংবাদ..........114

১. ছমাসের জন্য বিশ্রাম

ছমাসের জন্য বিশ্রাম। অখণ্ড অবসর। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। তাই দেরি না করে গিন্নিকেতের খামারের হিসেব নিকেশ বুঝিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। যাবো ইংল্যান্ড।

উনিশশো পঁয়ত্রিশ সাল। জুনের শেষ ভাগ। বহুদিন আগে ইংল্যান্ডে এসেছিলাম।

ইংল্যান্ডে হাজির হয়ে আগে খোঁজ করলাম আমার প্রাণের বন্ধু এরকুল পোয়ারোর। লন্ডনের এক আভিজাত্যপূর্ণ এলাকায় দামী ফ্ল্যাটে নাকি সে আছে, অনুসন্ধান করে জানলাম।

আমি তার ফ্ল্যাটে গিয়ে তো একেবারে থ। একেবারে রাজকীয় ব্যাপার চাকর-বাকরের অভাব নেই। তবে ফ্ল্যাটের ঘরগুলো দেখে আমার ঠিক মন ভরলো না। কোনোটা ত্রিভুজাকৃতি, কোনোটা আবার পঞ্চভুজ। এরকম আকৃতির ঘর করার কারণ কি জানতে চাইলাম বন্ধুর কাছে।

সে আমার প্রশ্নের জবাবে জানালো–চারপাশে সরলরেখার এত ছাড়াছাড়ি যে সরল জীবনযাপনের জন্য এ এক আদর্শ পীঠস্থান। কি তাই তো?

আমি ঘাড় নেড়ে তাকে সায় জানালাম।

আমরা দুজনে অনেকদিন পর মিলিত হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে হাসি-ঠাট্টায় গা ভাসিয়ে দিলাম। হঠাৎ পোয়ারোর চেহারার দিকে নজর পড়লো আমার।

বন্ধু, তোমাকে অনেকদিন পর দেখছি। কিন্তু তোমার চেহারার পরিবর্তন কিছু দেখছি না তো, চেহারার উজ্জ্বলতা আগের তুলনায় খানিকটা বেড়েছে। চুলও সাদা হয়নি এখনও। তুমি কি বুড়ো হবে না। এর কারণ কি?

–এর কারণ, পোয়ারো স্মিত হেসে জবাব দিলো। তুমি একে বৈজ্ঞানিক বা অবৈজ্ঞানিক যা-ই বলো না কেন, মাঝে মাঝে তারও একটু হেরফের হয়। তুমি বরং এত না ভেবে প্রশ্নের সমাধান তুমি নিজেই করে ফেলো।

এই বলে পোয়ারো তার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। পাশেই তার শোবার ঘর। ঐ ঘরে গিয়ে ঢুকলো। খানিক বাদে হাতে একটি ছোট্ট শিশি নিয়ে আমার সামনে হাজির হলো। আমার হাতে দিলো।

আমি শিশিটা হাতে নিয়ে গায়ে লাগানো লেবেলটা পড়তে লাগলাম। আসলে শিশিটা কলপের।

-এবার বুঝেছি, তোমার চুলে এখনও পাক ধরেনি কেন? তুমি কলপ ব্যবহার করো। তাহলে এরপর এসে দেখবো আমার বন্ধু প্রবর একজোড়া ইয়া বড় মোচ লাগিয়ে নাক উঁচু করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

গোঁফের ব্যাপারে পোয়ারো আগাগোড়া একটু স্পর্শকাতর।

-না, সেদিন যেন জীবনে না আসে, এই প্রার্থনা ঈশ্বরের কাছে করে পোয়ারো জবাব দিলো। নকল গোঁফ, ভাবতেও ঘেন্না করে। কথা শেষ করে সে তার গোঁফ জোড়ায় হাত বুলোত লাগলো।

সে যে মনে মনে একটু বিরক্ত হয়েছে বুঝে তাই প্রসঙ্গ পাল্টালাম।

–গোয়েন্দাগিরি তাহলে তুমি সত্যিই ছেড়ে দিয়ে অবসর নিলে?

-না, ছাড়িনি, ভেবেছিলাম, অবশ্য অনেকদিন আগে ভেবেছিলাম। তারপর ঠিক করলাম অযথা সময় নষ্ট না করে বিজ্ঞানের কারিগরি নিয়ে মাথা ঘামাই। তাই বইপত্রও কিনলাম বেশকিছু অর্থ ব্যয় করে। কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ যখন শেষ করে ফেলেছি, এমন সময় শুনলাম একটি খুনের খবর। অতএব আবার সেই গোয়েন্দাগিরি শুরু করলাম। একটু থেমে পোয়ারো বলতে থাকে, আসলে কি জানো যেখানেই সূক্ষ্ম বিচার সেখানেই পোয়ারো স্বয়ং হাজির। তখন মাথার মধ্যে অকেজো স্নায়ু কিলবিল করে ওঠে। বলো, চুপ করে বসে থাকা যায়? আর এই বুদ্ধিটুকুর জন্য সেদিন নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেলাম।

-বাঃ, খুনির কাজের প্রশংসা করতে হয়।

–তা যা বলেছো, তুমি তো এতদিন পর এলে...কেমন যেন একটা বিপদের গন্ধ পাচ্ছি।

–বিপদ? তার মানে?

-হ্যাঁ, ভাই। হেস্টিংস, ভাগ্যের ওপর সম্পূর্ণ আস্থা রাখি। পোয়ারো বলতে থাকে, তোমাকে তোমার নিয়তি এতদিন পরে আমার কাছে টেনে এনেছে। বিপদ তোমার মাথার শিয়রে। এ গন্ধ চিনতে আমার ভুল হয় না বন্ধু।

-তুমি কি সে রকম কিছু আন্দাজ করতে পেরেছো?

–হয়তো পেরেছি...হয়তো পারিনি...হয়তো, পোয়ারো ধোঁয়া ধোঁয়া ভাবে উত্তর দিলো।

তার মুখে বিচলিত ভাব লক্ষ্য করলাম। সে দেরাজ টেনে বের করলো, কাগজপত্র সাজানো রয়েছে। ওর মধ্যে থেকে কয়েকটা প্রয়োজনীয় কাগজ এনে আমার হাতে দিলো। তারপর বললো, তুমি এই কাগজগুলো প্রথম থেকে পড়ে যাও। তারপর কি বুঝতে পারছো তা আমাকে বলবে।

আমি হাতে নিয়ে দৃষ্টি দিলাম, ওগুলো কয়েকটি চিঠি।

চিঠির ভাষা এইরকম—

নমস্কার পোয়ারো মশাই, দণ্ডবৎ,
আপনার অসীম ক্ষমতা সম্পর্কে আমি অবগত আছি। আমাদের ব্রিটিশ পুলিশদের মাথা গবেট। কিছুই ওদের মগজে ঢোকে না। আপনি নাকি সব অদ্ভুত রহস্যের সমাধান ঝটাপট করে দেন। গোয়েন্দাপ্রবর, এবার আপনার বুদ্ধির খেলা দেখান তো। আরে বাবা, এ যেমন-তেমন ব্যাপার নয়। ভীষণ শক্ত চাই। এ মাসের একুশ তারিখে এ্যান্ডোভারে কেমন নাকানি-চোবানি খাওয়াই, সেটাই কেবল চোখ মেলে দেখবেন।

ইতি

বশংবদ

এ.বি.সি. তারপর একটি খাম আমার হাতে দিলো–এটা দেখো।

লক্ষ্য করলাম, লন্ডনের পোস্ট অফিসের স্টাম্প মারা। ঠিকানাটা হাতে লেখা নয়। টাইপ করা হয়েছে। বললাম–এ নিশ্চয়ই কারো পাগলামি।

কেবল কি পাগলামো? পোয়ারো বলতে থাকে–কথায় আছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন কোনো কাজ নেই যা পাগলে পারে না।

পৃথিবীতে খ্যাতিসম্পন্ন মানুষরা এমন চিঠি দিনে কয়েকখানা করে পায়। আমি বললাম। এ নিয়ে তোমার মাথা ঘামানোর কোনো যুক্তি দেখি না। এই চিঠির ব্যাপারে কোনো খোঁজ নিয়েছো?

-না, জ্যাপের সঙ্গে দেখা করে চিঠিটা দেখিয়েছিলাম। সে-ও তোমার মতো কথা বললো। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে নাকি এধরনের চিঠি স্তূপ করে জমা রাখা আছে। কিন্তু এ চিঠিতে এমন কিছু আছে যা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে।

–সেটা কি, বলবে তুমি?

আমার কথায় কর্ণপাত না করে সে মুখ বুজে রইলো।

অতএব আমি কৌতূহলী হয়ে ঐ কথার জের টেনে বললাম–চিঠিখানা নিয়ে এত না ভেবে . সন্দেহ নিরসনের ব্যবস্থা করো।

কিন্তু হেস্টিংস, আমি এ ব্যাপারে কি করতে পারি। পুলিশকে দেখলাম, গুরুত্ব দিলো না। তোমারও ঐ হাল লক্ষ্য করলাম।

টাইপ করা চিঠি। তাই হাতের লেখা ধরার উপায় নেই। তাই আমি বললাম–অনুমানের ওপর নির্ভর করে তোমাকে এগোতে হবে। কোনো সূত্র পেলেও পেতে পারো।

–আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পোয়ারো চটপট করে বলে উঠলো, কিছু অঘটন খুব শিগগিরই ঘটতে চলেছে। এটা আমার ধারণা নয়। আমার দীর্ঘদিনের কাজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি।

-আসছে শুক্রবার, একটা দিন কেটে যাবে, শনিবার কাগজ খুলে দেখবে, কিছুই ঘটেনি, হয়তো বা এ্যান্ডোভারে একটা ছোটোখাটো কেলেঙ্কারি হয়েছে।

–আহা, যদি তোমার সান্ত্বনা কাজে লাগতো।

সান্ত্বনা! ডাকাতি আর সান্ত্বনা এক হলো!

-না হেস্টিংস, তুমি আমার কথার মানে বুঝতে পারছে না। দুটো এক জিনিস নয় ঠিকই তবে একদিক থেকে বিচার করলে কিছু মারাত্মক অঘটনের তুলনায় এ সান্ত্বনাই হোক।

–অঘটন বলতে...

–খুন। শুধু একটা শব্দ পোয়ারোর মুখ দিয়ে উচ্চারিত হলো।

প্রায় ছফুট লম্বা মিঃ আলেকজান্ডার বোনাপার্ট। তিনি কাস্ট চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালেন, ভুরু কুঁচকে তাকালেন, চোখে কম দেখেন। লোকটাকে ঠকবাজ, প্রতারক বলে মনে হয়।

ছোট্ট ঘরটি তার শোবার ঘর। অগোছালো অপরিচ্ছন্ন। ছোট ছোট চোখে তিনি ঘরের চারদিকে তাকালেন। দেখে মনে হয় যেন চোখ বন্ধ। দেওয়ালে ঝুলছে বাদশাহী আমলের কোট। কোটের পকেটে তিনি হাত ঢোকালেন। একটা সস্তাদামের সিগারেট আর দেশলাই বের করলেন। তারপর ধীর পায়ে টেবিলের সামনে এসে বসলেন। একটা কাগজ চোখের সামনে মেলে ধরলেন। টাইপ করা নামের তালিকা লক্ষ্য করে একটা নামের ওপর দাগ দিলেন।

জুন মাস, আজ কুড়ি তারিখ, বৃহস্পতিবার। সেদিনের পর এ ব্যাপারে পোয়ারোর সঙ্গে আর কথা হয়নি।

স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ইনসপেক্টর প্রধান জ্যাপ এলো ঠিক তার দুদিন পর অর্থাৎ বাইশ তারিখে। আমাকে দেখে হৈ হৈ করে এগিয়ে এলো।

–সত্যিই, আপনাদের দেখে পুরোনো দিনের অনেক কথা মনে পড়ে যায়। তারপর ইনসপেক্টর আমার টাক লক্ষ্য করে বললো, ওটি কেবল এগোচ্ছে।

অনেকদিন পর দেখা হওয়ার প্রথম কথা এমন ধরনের, আমি একটু বিরক্ত হলাম মনে মনে।

পোয়ারোর চেহারা নিয়ে সে গর্ব বোধ করলো। বললো, যেখানেই যাই কেবল এরকুল পোয়ারো আর পোয়ারো। এবার এই কাজ থেকে ইস্তফা দিয়ে আমাদের সুযোগ করে দিন।

–অবসর নেবো বলেই বসে আছি। কিন্তু সুস্থির থাকার সুযোগ মিলছে না।

–দেখুন, হয়তো শেষ পর্যন্ত নিজের খুনের তদন্তেই আপনাকে না নামতে হয়।

–বা রে, এ যে দেখছি ভূতের মুখে রাম নাম।

পোয়ারো পাল্টা জবাব না দিয়ে আমার দিকে কেবল তাকালো।

কয়েকদিন চুপচাপ থাকার পর তোমার এই আইডিয়া নিয়ে সে দেখবে দারুণ এক গল্প তৈরি করেছে। আমি বললাম।

জ্যাপ হো হো করে হেসে উঠলো। প্রসঙ্গ পাল্টে আমার দিকে তাকিয়ে বললো–আপনি কি সেই অদ্ভুত চিঠিটা দেখেছেন?

জবাবে পোয়ারো বললো–হ্যাঁ, আমি দেখিয়েছি। ওখানে শুধু একটা তারিখ ২১ শে জুনের উল্লেখ আছে।

-হ্যাঁ, তাই আমি এখানে আসার আগে এ্যান্ডোভার থানায় ফোন করেছি। ওরা জানালো তেমন কিছু খবর নেই। কেবল একটা দোকানের শোকেস ভাঙা ছাড়া। আপনি এ ব্যাপারে আর চিন্তা করবেন না। যাদের খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই তারাই এমন গোছের মস্করা করে। এসব তুচ্ছ ব্যাপার এ বয়সে আর ভাববেন না। এখানে একটা কাজে এসেছিলাম। তাই একটু দেখা করে গেলাম।

জ্যাপের কথার ধরন-ধারণে বোঝা গেল ওর আচরণের কোনো রদবদল হয়নি।

বললাম–তাহলে তোমার চিঠির ব্যাপারটা পর্বতের মুষিক প্রসবের নামান্তর।

পোয়ারোর ঠোঁটে শুকনো একটু হাসির ঝিলিক দিয়ে উঠলো।

–এরকম আশা করিনি আমি, ভুল হয়ে গেলো।

বেশ তো, এটা ছেড়ে অন্য কোনো রহস্যের সন্ধান কর। আমি তাকে সান্ত্বনা দিলাম।

-ঠিক আছে। পোয়ারো বললো, যখন সত্যি রহস্য পেলাম না, তখন এসো আমরা একটা নকল রহস্য সাজাই।

আমি বললাম-ধরা যাক, প্রথমে একজন পুরুষ খুন হবে। তিনি হলেন খবরের কাগজের মালিক। রাজনীতিও করেন না, ব্যাবসা করেন না। রক্তাক্ত দেহে লাইব্রেরির ছোট্ট টেবিলে তাকে পড়ে থাকতে দেখা গেল।

মনে কর পিস্তল দিয়ে তাকে খুন করা হয়েছে। সন্দেহের তালিকায় পাওয়া গেলো একটি মেয়েকে। যার সঙ্গে লোকটির প্রেমের খেলায় ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিলো, এছাড়া রয়েছে, একজন বয়স্কা মহিলা, একজন সেক্রেটারি, আর একজন যুবক যে প্রেমের খেলায় লোকটির প্রতিপক্ষ। এছাড়া এক ধাপ্পাবাজ বয়স্ক লোক, ছাঁটাই হওয়া কিছু কাজের লোক এবং জ্যাপের মতো বোকা মাথাওয়ালা একজন গোয়েন্দা। ব্যাস, গল্পের এখানেই ইতি।

শেষ? পোয়ারো হতবাক হয়ে প্রশ্ন করলো, এ তো সেই চিরাচরিত গল্প হেস্টিংস। একটা নতুন গল্প বানাও।

–আর আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তুমিই নতুন গল্প বলল।

-বেশ, তাই হোক, তবে আমার গল্পে কোনো জটিলতা নেই। কোনো আবেগ টাবেগের সহবাস নেই সেখানে। সাদামাটা যেমন হওয়া উচিত তেমনই অপরাধজনক গল্প।

মনে করো, একটি ঘরে চারজন লোক বসে ব্রিজ খেলছে। ফায়ারপ্লেসের পাশে একটি চেয়ারে আর একজন লোক বসে আছে। সন্ধে নাগাদ ঘটে গেল অঘটন। পঞ্চম লোকটি খুন হয়েছে। চারজনের মধ্যে একজন ডামি অবস্থায় খেলার মাঝখানে উঠে গিয়ে তাকে খুন করেছে। খেলার ঝোঁকে সেটা অন্যদের নজরে পড়েনি। এখন প্রশ্ন হলো, খুন করলো কে?

পোয়ারোর গল্প শুনে আমি একটুও উত্তেজিত হলাম না।

পোয়ারো সেটা লক্ষ্য করে বাঁকা চোখে আমার দিকে তাকালো–হেস্টিংস, তোমরা লেখকরা এখন সস্তা জিনিসকে ভালোবেসে লিখছে। তোমরা অনেক খুনের গল্প চাও।

–কথাটা ভুল নয়। প্রথম খুনের পর পাঠককে ধরে রাখার জন্য দ্বিতীয় খুনের প্রয়োজন হয়। কথার মাঝে ফোন বেজে উঠলো, পোয়ারো এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুলে নিলো। দু-মিনিট পরে সে নিজের জায়গায় ফিরে এলো। অমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম।

তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই নিজে বললো–জ্যাপ ফোন করেছিলো। ও এখান থেকে এ্যাভোর থানায় যায়। সেখানে একটা ঘটনা ঘটেছে। রাস্তার পাশে সিগারেট, খবরের কাগজের দোকানের সামনে এ্যাস্বার নামে এক বয়স্কা মহিলা মৃত অবস্থায় পড়ে আছে।

-খুনই যখন করলো তখন বুড়িকে না করে একটা চুঁড়িকে করতে পারতো।

–এ্যান্ডোভারের পুলিশের ধারণা, খুনী তাদের অজানা নয়। তারা তাকে যখন খুশী গ্রেপ্তার করতে পারে। পোয়ারো গম্ভীর কণ্ঠে জানালো, মনে হয় স্বামীর সঙ্গে মহিলাটির বনিবনা ছিলো না। অপদার্থ মাতাল স্বামী স্ত্রীকে সর্বদা খুন করবে বলে ভয় দেখাতো।

লোকটিকে ধরার আগে পুলিশ পোয়ারোর চিঠিটা দেখতে চায়। তাই আমরা রোমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

ঘণ্টাখানেকের পথ। পোয়ারো গাড়িতে উঠে কেবল একটাই কথা বললো–হেস্টিংস, এই শুরু। থানায় গিয়ে হাজির হতেই পুলিশ ইনসপেক্টর হাসিমুখে আমাদের অভ্যর্থনা জানালো। ছফুট দশাসই চেহারর সদালাপী মানুষ। আমরা তার ব্যবহারে খুশী হলাম।

আমাদের খুনের বর্ণনা করলো। সে বলতে তাকে–খুনটা হয়েছে বাইশ তারিখ ভোরে। আমাদের একজন কনস্টেবল ডোভার মৃতদেহ আবিষ্কার করে। সে তার দোকানের খোলা দরজার কাউন্টারের সামনে মৃত অবস্থায় পড়ে ছিল। মেডিকেল রিপোর্টে জানা গেছে, আচমকা তাকে পেছন থেকে আক্রমণ করা হয় এবং কোনো ভারী অস্ত্র দিয়ে তার মাথায় আঘাত করা হয়েছে। বিকেল সাড়ে পাঁচটায় এবং ছটা বেজে পাঁচ মিনিটে দুজন ক্রেতা দোকানে গিয়েছিলো। তাদের সন্ধান পাওয়া গেছে। তাই বলা যেতে পারে ঐ সময়ের মধ্যে মহিলা খুন হয়েছে। কিন্তু এই পঁয়ত্রিশ মিনিটের মধ্যে মহিলার স্বামীকে তার দোকানের ধারে-কাছে দেখা যায়নি। রাত নটার সময় ফ্রি ক্রাউন্স শুড়িখানায় তাকে দেখা গেছে।

মহিলার স্বামীর চরিত্র সম্পর্কে পোয়ারো কৌতূহল প্রকাশ করলে ইনসপেক্টর জানালো ভদ্রলোক জাতে জার্মান। আগে খানসামার কাজ করতো। কিন্তু মাতলামির জন্য সে চাকরি তাকে হারাতে হয়। অগত্যা মিসেস এ্যাম্বার কি করবেন, কাজে নামতে হলো। মহিলা যা রোজগার করতো সব অর্থ ঐ মাতালটার হাতে দিয়ে দিতো। তবু তার মন ভরত না। মিস রোজের বাড়িতে মিসেস এ্যাম্বার কাজ করতে গেলো। তারপর মিস রোজ মারা যায়। ঐ সময় মহিলা কিছু অর্থ পায়। সেই অর্থ নিয়ে শেষে এই সিগারেট, খবরের কাগজের দোকান খোলে। মহিলার তবুও শান্তি ছিলো না। যখন তখন তার স্বামী দোকানে এসে হামলা করতো। অবশেষে কোনো উপায় না দেখে মহিলা তাকে সপ্তাহে

পনেরো শিলিং হাতখরচা দিতে শুরু করে। ওদের কোনো ছেলে-মেয়ে নেই। তবে মিসেস এ্যাম্বারের একটি সুন্দরী বোনঝি আছে।

–দোকান থেকে কোনো জিনিস চুরি যায়নি? পোয়ারো প্রশ্ন করলো।

–না।

–তাহলে উন্মত্ত অবস্থায় দোকানে ঢুকে গালিগালাজ করে স্ত্রীকে হত্যা করে!

–আপাতত তাই মনে হয়। পুলিশ ইনসপেক্টর গ্লেন এবার পোয়ারের কাছ থেকে চিঠি নিয়ে চোখ বোলালো। তারপর বললো–লোকটি জার্মান। তাহলে আমাদের ব্রিটিশ পুলিশ লিখবে কেন? তাছাড়া ওর মতো উন্মত্ত মাতাল লোকের পক্ষে টাইপ করা সম্ভব নয়। হয়তো তারিখটার সঙ্গে...এটা একটা নিছক কাকতালীয় ব্যাপার।

–সেটাই স্বাভাবিক পোয়ারো বললো; কিছুক্ষণ কি ভেবে তারপর জানতে চাইলো, মিসেস এ্যাম্বারের সঙ্গে তার আলাপ এবং বিবাহ।

এই সময় একজন কনস্টেবল ঘরে এসে ঢুকলো–মিঃ এ্যাম্বারকে থানায় আনা হয়েছে।

এ যেন দারিদ্র্য ও লাম্পট্যের এক প্রতিমূর্তি, কানসৎ এ্যাম্বারকে দেখে তাই মনে হলো।

গ্লেনকে দেখে লোকটি ভীষণভাবে চটে গেলো। চিৎকার করে বললো, এসব কি ইতরামি। জানেন, আপনার বিরুদ্ধে আমি মানহানির মামলা করতে পারি। আমি খুন করিনি। একটুক্ষণ থেমে নিজেকে সংযত করে বললো, কিছু মনে করবেন না। এই ছোট্ট

শহরে একজনও আমার মতো বুড়ো মানুষকে দয়া দেখায় না। ভালো ফর্মে না। এরপর লোকটি কেঁদে ফেললো।

গ্লেন বললো–থানায় তোমাকে আনা হয়েছে ঠিকই, তাই বলে তুমি যে দোষী সেটা প্রমাণ হচ্ছে না। যতক্ষণ না বিচার করে দেখা যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত বলা যায় না, তোমার স্ত্রীর খুনী তুমি।

এ্যাস্বার দুম করে ক্ষেপে গিয়ে বললো–আপনারা, গোটা ইংরেজ জাতটা আমার পেছনে লেগেছেন, আমি আবার বলছি, তাকে আমি খুন করিনি। অবশ্য তাকে আমি খুন করার ভয় দেখাতাম ঠিকই, কিন্তু সেটা ছিলো আমার তামাশা, এ্যালিসও সেটা ভালো করে জানতো। আমি কাল তার ধারেকাছে যাইনি। তার সঙ্গে কার্ডি, জর্জ, প্ল্যাট ছিল।

গ্লেন ইশারায় তাকে লকআপে বন্দী করতে বললো।

–আচ্ছা, ও যেসব লোকের নাম বললো, তারা কারা?

কারা আবার? ওরই মতো লম্পট শয়তানের দল।

–দোকান থেকে কি কোনো জিনিস চুরি যায়নি, আপনি নিশ্চিত?

হ্যাঁ, টাকাপয়সা খোয়া যায়নি। তবু দু-এক প্যাকেট সিগারেট সরলেও সরতে পারে।

–আচ্ছা, দোকানের অসামঞ্জস্য কোনো কিছু আপনার দৃষ্টিতে পড়েনি। পোয়ারো প্রশ্ন করলো।

কাউন্টারে একটা বই খোলা অবস্থায় পড়েছিলো, রেলওয়ে গাউড। যে পৃষ্ঠা দুটো খেলা ছিলো, তার মধ্যে এ্যান্ডোভারে যাওয়া-আসার ট্রেনের তালিকা ছিলো। মিসেস এ্যাম্বার এক পেনি দামের পকেট গাইড রাখতো।

সহসা পোয়ারোর চোখ খুশীতে ঝিলিক দিয়ে উঠলো। উৎফুল্ল হয়ে বললো–এটা কী ব্রাডশ না এ.বি.সি.?

পোয়ায়োর আগ্রহ দেখে গ্লেন বিস্মিত হলো-ওটা এ.বি.সি.।

.

মৃতদেহ দেখার জন্য পোয়ারো মর্গে গেল। মহিলার মৃত মুখটা দেখে পোযারোর দুঃখ হলো। সঙ্গের সার্জেন্টটি জানালো–যে অস্ত্রের সাহায্যে ওকে খুন করা হয়েছে সেটা পাওয় যায়নি।

পোয়ারো ডঃ কারকে জিজ্ঞেস করলো, যেটা দিয়ে আঘাত করা হয়েছে সেটা ব্যবহার করতে কি অনেক শক্তির প্রয়োজন হয়?

-না, তেমন কোনো বলপ্রয়োগ করতে হয় না।

–তাহলে খুনী পুরুষ বা মহিলা, যে কেউ হতে পারে। পোয়ারো বললো।

–সব কিছুই সম্ভব। তবে কি জানেন, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে সাধারণ নিয়মে পুরুষের কথাই আগে মনে আসে। কাউন্টারে গুটিসুটি মেরে পড়ে থাকতে দেখে ছটা পাঁচের কোন ক্রেতা তাকে দেখতে না পেয়ে চলে যায়।

মৃতদেহ দেখা শেষ করে পোয়ারো সেখান থেকে বেরিয়ে এলো।

ধরা যাক, এ্যাস্বার দোকানে গিয়ে বৌকে গালিগালাজ করেছিলো। সেটা নিশ্চয়ই পেছন থেকে নয়। সামনাসামনি ঘটবে। যাই হোক, তার আগে আমরা মিসেস এ্যাস্বারের বোনঝি-র সঙ্গে আলাপ করে আসি।

ঠিকানা নিয়ে আমরা নির্দিষ্ট বাড়ির সামনে গিয়ে হাজির হলাম। যেমন-তেমন বাড়ি নয়, অট্টালিকা, একজন সুন্দরী মেয়ে দরজা খুলে দিলো। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, মেরি ডোয়ার কিনা?

–হ্যাঁ, আমিই মেরি।

সে আমাদের বাড়ির মধ্যে নিয়ে গেলো। জানতে পারলাম, বাড়ির লোকেরা কেউ নেই। আমরা একটা ছোট্ট ঘরে গিয়ে বসলাম।

-তোমার মাসির মৃত্যু সংবাদ তুমি নিশ্চয় পেয়েছে। পোয়ারো বললো।

–হ্যাঁ, আজ সকালে খবরটা পেয়েছি। মেয়েটির গাল বেয়ে টপটপ করে জল গড়িয়ে পড়লো।

–পুলিশ তোমাকে এ্যান্ডোভারে যেতে বলেনি?

–হ্যাঁ, বলেছে। কিন্তু নিজের ইচ্ছেতে যেতে পারি না। যার চাকরি করি তার মতামত না পেলে যেতে পারি না।

–মাসিকে তো তুমি ভালোবাসতে।

-হ্যাঁ, মা-কে হারাবার পর আমি আমার মাসির সঙ্গে লন্ডনে পাঁচ বছর কাটিয়েছি। তারপর আমি চাকরি জীবন শুরু করি। তখন অন্তত সপ্তাহে একবার তার সঙ্গে দেখা করতে যেতাম। জানেন, ঐ হতচ্ছাড়া জার্মানটাকে নিজের মেসোমশাই ভাবতে গা ঘিন ঘিন করে। মাসিকে সব সময় তিনি ভয় দেখাতেন, বলতেন, গলা কেটে ধড়-মুণ্ডু অলাদা করে দেবে। ছুরি মেরে খুন করবে।

-আচ্ছা, তোমার মাসির খুন হওয়ার খবর পেয়ে তোমার প্রথমে কি মনে হলো?

পোয়ারো তার কাছে জানতে চাইলো।

-প্রথমে কথাটা বিশ্বাস হয়নি। কারণ আমার মেসোমশাই মুখেই লম্ফঝম্ফ করতো। কিন্তু আসলে লোকটা একটা ভীতুর ডিম।

-ধরো, তোমার মাসিকে তোমার মেশোমশাই খুন করেনি।

করেনি?

এ.বি.সি. মার্ডার–আমি নিশ্চিত নই। এটা ধরে নিচ্ছি। খুনী কে, এ সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণা আছে?

–না না, আমরা এ সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই।

–আচ্ছা, তুমি বলতে পারবে, তোমার মাসির নামে কোনো টাইপ করা চিঠি আসতো কিনা?

-না, আমি ছাড়া মাসির কোনো জীবিত আত্মীয় নেই।

–তোমার মাসির সঞ্চয়?

–সেই টাকা দিয়ে মাসির সংসার চালানো ছাড়া আর কিছু হবে না।

–আচ্ছা মেরি, তোমাকে পরে আমার দরকার হতে পারে, পোয়ারো বললো, তোমাকে এই ঠিকানায় চিঠি দিতে পারি তো?

-না, এ শহরে আর কি করতে থাকবো? আমার মাসি-ই যখন রইলো না। আমাকে ভীষণ ভালোবাসতেন। আমি ঠিক করেছি, এখান থেকে লন্ডনে চলে যাবো।

–বেশ, যাওয়ার আগে তুমি আমার এই ঠিকানায় যোগাযোগ করে তোমার হদিশ জানিও।

–আপনি একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ।

–তাহলে মাসির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে কি কোনো অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে?

–হ্যাঁ, আমরা তোমার কাছ থেকে সাহায্য আশা করতে পারি কি?

নিশ্চয়ই, আমি রাজী।

এবার আমরা ওখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম। হাজির হলাম মিসেস এ্যাম্বারের দোকানে। এই সময়ে আমার উদ্দেশ্যটা হলো, পোয়ারো ঠিক কালকের পরিবেশটা তৈরি করতে চেয়েছিল, আজ রাস্তাটা ফাঁকা। তবে খানিক বাদে লক্ষ্য করলাম জায়গায় জায়গায় কয়েকজন মিলে জটলা করতে। দোকানের সামনে সব বয়সের লোক ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। উল্টোদিকের ফুটপাথ থেকে আমরা স্পষ্টভাবে দোকানের নামটা লক্ষ্য করলাম।

এ. এ্যাম্বার।

ভিড় সরিয়ে আমরা দোকানে গিয়ে ঢুকলাম। পুলিশও রয়েছে সেখানে, দোকানে একটা স্তিমিত আলো জ্বলছে। ফলে পরিবেশটা কেমন ভুতুড়ে হয়ে উঠেছে। কয়েকখানা সস্তা দামের ম্যাগাজিন দোকানের একপাশে পড়ে আছে যেগুলো গতকাল বিক্রি হয়নি। কাউন্টারের ওপর এক কোণে দুটো কাঁচের জার। একটাতে পিপারমেন্ট ও অন্যটাত মিহিদানার চিনি রয়েছে।

রেলওয়ে গাইডটা কোথায় ছিল সেটা কনস্টেবলের কাছ থেকে জানা গেল। সে বললো- মনে হয় লন্ডনে যাওয়ার ট্রেনের সময় খুনী ঐ গাইডবুক দেখছিলো বা কোন ক্রেতা ভুল করে ওটা ফেলে রেখে গেছে।

আমি এবার প্রশ্ন করলাম–কোনো হাতের ছাপ পাওয়া গেছে?

-না স্যার। তবে কাউন্টারের ওপরে কয়েকটি হাতের ছাপ এমনভাবে জড়িয়ে আছে যা থেকে চেষ্টা করেও কিছু উদ্ধার করা সম্ভব নয়।

এবার আমরা দোতলায় গেলাম যেখানে মিসেস এ্যাস্বার থাকতো। জায়গাটা বেশি বড় নয়। তবে পরিপাটি করে সাজানো। অগ্নিকুণ্ডের ওপরে একটি ছোট স্ট্যান্ডে তিনখানা ছবি রাখা। একটা মেরির ফটো, দ্বিতীয়টি এক বয়স্কা মহিলার। হাতের কব্জিতে ব্রেসলেট রয়েছে। পরনে দামী ফারের কোট। বেশ সচ্ছল ঘরের মহিলা সেটা পরিষ্কার বোঝা গেল। ইনি বোধহয় মিস রোজ। তৃতীয়টি বহু পুরানো। এক যুবক ও এক যুবতী হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে, যুবকের পকেটে একগুচ্ছ গোলাপ শোভা পাচ্ছে। মনে হয় কোনো আনন্দ উৎসবে ছবিটি তোলা হয়েছিলো।

পোয়ারো বললো–এই ছবিটা মিঃ এবং মিসেস এ্যাস্বারের বিয়ের ছবি।

পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। একেবারে ফাঁকা। কোনো আসবাবপত্র নেই তবে বাঁপাশে একটা ছোট শেলফ, তাতে কিছু বাসনপত্র রয়েছে এবং পোশাক রয়েছে কিন্তু খুঁজে পেতে কোনো চিঠি পাওয়া গেল না।

আমরা এ. এ্যাস্বার থেকে বেরিয়ে এলাম। উল্টোদিকের ফুটপাথে একটি মেয়ে বসে আনাজপত্র বিক্রি করছিল, পোয়ারো তার দিকে এগিয়ে গেল। সেখান থেকে সে কিছু

সবজি কিনলো, তারপর মেয়েটিকে লক্ষ্য করে বললো–আপনার দোকানের সামনে এরকম একটা খুন হওয়ায় আপনি ভীষণ ঝামেলায় পড়েছেন তাই না?

-কি আর বলবো। সকাল সন্ধে সবসময় তোক গিজগিজ করছে। কিন্তু কাল যদি এত লোকের ভিড় এখানে থাকতে হয়তো খুনটা হত না। অমন লম্বাচওড়া দাড়িওয়ালা লোকটা দোকানে ঢুকে কেমন করে খুন করে বেরিয়ে গেল...।

-তাই নাকি? আপনাকে কে বললো?

-কে আবার বলবে? লোকে কানাকানি করছে, তাই শুনছি। পুলিশ নাকি তাকে হাতকড়া পরিয়েছে। আহা-হা, শেষ পর্যন্ত বুড়িটার একটা উটকো লোকের হাতে মরণ হলো।

-আপনি কি তাকে দেখেছেন?

-না, সুযোগ বা সময় হয়নি। দোকানে সব সময় খদ্দেরের ভিড়। তবে দাড়িওয়ালা কাউকে আমার নজরে পড়েনি।

–ভুল শুনেছেন, আমি কথা বলে উঠলাম, লোকটা মোটেই দশাসই চেহারার নয়।

লক্ষ্য করলাম, আমার এই কথা শুনে আরো লোক দাঁড়িয়ে পড়লো। তবে প্রত্যেকে যা বললো, তার মূল কথা হলো বিকেল থেকে সন্ধে পর্যন্ত প্রায় জনা চারেক কালো রোগা বেঁটে চোহারার লোক দোকানে ঢুকেছে।

আসলে পোয়ারোর উদ্দেশ্য ছিল কায়দা করে জেনে নেওয়া যে ঐ দোকানে অচেনা লোক ঢুকেছিল কিনা।

-ভণিতার প্রয়োজন ছিলো, নতুবা কোনো ইংরেজ মুখ খুলতে না। পোয়ারো বললো। শামুকের মতো নিজেদের খোলর মধ্যে ঢুকিয়ে রাখবে। কিন্তু এলোমেলোভাবে কিছু বলতে সব কথা হুড়মুড় করে বলে যাবে।

এরপর আমরা একটা ছোটো টিলার ওপর উঠলাম। লক্ষ্য করলাম ওখান থেকে মিসেস এ্যাম্বারের দোকানটা দেখা যায় কিনা। হ্যাঁ, দোকানটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পোয়ারো একটা মাঠকোঠা বাড়ির দরজায় করাঘাত করলো। একটা ছোটো ছেলে এসে দরজা খুলে দিলো। পেছনে পেছনে তার মা এসে জানালো–আমরা কিছু নেবো না।

–আমরা ইভনিং ফ্লিকার পত্রিকার তরফ থেকে আসছি। পোয়ারেরা মিথ্যের আশ্রয় নিলো। মৃত এ্যাম্বার সম্পর্কে আমরা কিছু আপনার কাছ থেকে জানতে চাই। বিনিময়ে আপনি পাঁচ পাউন্ড পাবেন।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মহিলার মধ্যে খুশী লক্ষ্য করলাম। তাড়াতাড়ি আমাদের বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেলো।

মহিলা নিজের পরিচয় দিলো।

মিসেস ডরোথি, ডরোথি ফাউলার।

পোয়ারো তার সামনে টাকাটা মেলে ধরলো। মহিলা বলে চললো-মিসেস এ্যাস্বার তেমন মিশুকে ছিলো না। রাত আটটায় দোকান বন্ধ করে নিজের ঘরে সেই যে ঢুকতো আর বেরোতে না। তার স্বামীটা ছিলো মাতাল, লম্পট। ফলে মহিলাকে অনেক দুর্ভোগ সহ্য করতে হত। শেষ পর্যন্ত ঐ শান্ত মহিলাটিকে খুন করে মাতালটা তার কষ্টের অবসান ঘটালো।

–আচ্ছা, আপনি কি জানেন, মিসেস এ্যাস্বার কোনো বেনামী চিঠি পেতেন কিনা?

একটুক্ষণ চুপ করে মিসেস ডরোথি বললো, গালমন্দে ভরা চিঠি? না, সেরকম কিছু আমার কানে আসেনি।

-কাল কোনো সময়ে মিঃ এ্যাস্বারকে দোকানের আশেপাশে দেখেছেন?

–দেখবো কি করে? চোরের মতো এসে নিজের কাজ সেরে সরে পড়েছে।

আশানুরূপ কোনো তথ্য পাওয়া গেল না। তবুও কথামতো পোয়ারো তার হাতে টাকা দিলো।

ওখান থেকে বিদায় নিয়ে আমরা থানায় এলাম। গ্লেনকে দেখলাম, খুব ক্লান্ত লাগছে। সারাদিন তার অনেক ধকল গেছে। দোকানের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা লোকেদের জিজ্ঞাসাবাদ করে যেটা বোঝা গেছেমিঃ এ্যাস্বারকে কেউই চোখে দেখেনি। অতএব ঐ নামের তালিকা থেকে দুটো নাম নোট করে নিয়ে আমরা থানা থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

বড় রাস্তার ওপরে মিঃ পাত্রিজের বাড়িতে প্রথমে গিয়ে ঢুকলাম। তিনি মিসেস এ্যাস্বারকে শেষ জীবিতাবস্থায় দেখেছিলেন সাড়ে পাঁচটায়, সিগারেট তামাক কিনতে গিয়ে। তবে শেষ দেখা কথাটার ওপর তিনি ভীষণ জোর দিলেন। তার মতে, তার পরেও দোকানে অনেকে জিনিস কিনতে গিয়েছিলো।

–ঠিক বলেছেন। তবে তাদের কেউই আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসেনি। পোয়ারো বললো।

-আসলে কি জানেন মিঃ পোয়ারো, আমার মতো কর্তব্যজ্ঞান অনেকের নেই। সাক্ষ্য প্রমাণের ওপর নির্ভর করে খুনিকে ধরতে পুলিশের সুবিধা হবে বলেই আমি মনে করি। তিনি বলে চললেন, আমি যখন ওর দোকানে ঢুকলাম। তখন ঘড়িতে সাড়ে পাঁচটার ঘণ্টা পড়ে। আমি মাঝে মাঝেই ঐ দোকানে যেতাম। আমাদের মধ্যে ক্রেতা-বিক্রেতার সম্পর্ক ছিলো।

–আচ্ছা, তার স্বামী যে তাকে খুন করবে বলে শাসাতো, সেটা কি আপনি শুনেছেন?

–ওর যে স্বামী আছে সেটা আমার অজানা ছিলো। আপনার মুখে এই প্রথম কথাটা শুনলাম।

–আচ্ছা, তাকে কোনোদিন চিন্তিত বা উদ্বিগ্ন হতে দেখেছেন?

–না, যতদুর মন পড়ছে, ঐদিন তাকে অন্যান্য দিনের মতো স্বাভাবিক দেখেছিলাম।

আমরা দরজার দিকে ফেরার জন্য পা বাড়ালাম। হঠাৎ পোয়ারো থমকে দাঁড়িয়ে জানতে চাইলোআপনার কাছে কি এ.বি.সি. গাইড আছে? যদি দেন, তহলে লন্ডনে ফেরার সময়টা..

এতে এত দ্বিধা করার কি আছে? আপনার পেছনের শেলফে গাইডটা আছে। শুধু এ.বি.সি. নয় ব্রাড়শ থেকে শুরু করে ইয়ার বুক পর্যন্ত আপনি পাবেন।

আট পৃষ্টায় এ্যান্ডোভার ট্রেনের সময় দেখার আছিলা করে খানিকক্ষণ এলোমেলোভাবে ঘাঁটাঘাঁটি করে ওখান থেকে চলে এলাম।

এরপর আমরা চিনেমাটির বাসন প্রস্তুতকারী আলবার্ট রিডিলের সঙ্গে দেখা করলাম। বাড়ির বাইরে তার কারখানা। পোয়ারো তার সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্য জানালো।

জবাবে লোকটি বললো–ঐ ব্যাপারে পুলিশকে যা বলার বলেছি। আপনারা বরং তাদের কাছ থেকে দরকার মতো জেনে নেবেন। আপনি ভাবলেন কি করে, যে যখন যা জানতে আসবে তার সঙ্গেই আমি কথা বলতে বসে যাবো। আমার কি কোনো সময়ের দাম নেই? এটা আপনারা ভাবলেন কি করে? রিডেল প্রায় ধমকের সুরে বললো।

তারপর তর্কের মধ্যে দিয়ে মিঃ রিডেল জানালো, গতকাল সন্ধে ছটার সময় যখন সে দোকানে গিয়েছিলো তখন বাইরে থেকে দরজা বন্ধ ছিলো, একটু ঠেলা দিতেই দরজা খুলে যায়। ভেতরে ঢুকে কাউন্টারে কাউকে দেখতে না পেয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে আসে। কোনো মৃতদেহ তার নজরে পড়েনি। তবে কাউন্টারে একটা রেলওয়ে গাইড তার নজরে পড়েছিলো।

পোয়ারো একের পর এক প্রশ্ন করে যেতে লাগলো।

বিরক্ত হয়ে রিডেল বললো, আমি এমন কি সন্দেহজনক কাজ করেছি, যার জন্য আপনারা আমার পেছনে লেগেছেন?

–অত ঘাবড়াবার কিছু নেই, পোয়ারো গম্ভীরভাবে বললো–সব জানবেন, খুব শীগগির জানবেন, আজ আসি।

ট্রেন ধরার তাড়া আছে আমাদের। তাই দেরি না করে ওখান থেকে চলে এলাম, প্রথম শ্রেণীর কামরায় আমরা কেবল দুজন।

পোয়ারো চোখ বন্ধ করে বললো, আমাদের ঐ অপরাধীটি লম্বায় সাড়ে পাঁচ ফুট। মাথার চুল কালো, বাঁ চোখটা একটু ছোটো, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে। কাঁধ বরাবর নিচের দিকে একটা তিল আছে।

আততায়ীর চেহারার বর্ণনা ওর মুখে শুনে আমি থ হয়ে গেলাম।

সে আবার বলতে থাকে–প্রকৃতপক্ষে আততায়ীর বিন্দুমাত্র পরিচয় আমার জানা নেই। সে কোনো সূত্র আমাদের জন্য রেখে যায়নি। এমনকি সিগারেটের ছাইও পাওয়া যায়নি। চালাক আছে লোকটা, কি বলো হেস্টিংস। তবে গাইডটা সে-ই ফেলে গেছে, এবং এর পেছনে একটা উদ্দেশ্য আছে। কিন্তু গাইডে হাতের ছাপ পাওয়া যায়নি। সে তার সম্পর্কে

কিছু পরিচয় জানাতে না চাইলেও সে প্রমাণ করতে চায় যে সে ভীষণ চালাক। গাইড বুকটা তারই প্রমাণ। তবে ওর সম্পর্কে একটা ধারণা আমি মনে মনে তৈরি করেছি।

...যে দামী কাগজ ছাড়া কাগজ কেনে না, যে টাইপ করার সময় অতিরিক্ত যত্ন নেয়। নিজের ব্যক্তিত্ব বা নিজের শক্তি লোককে জাহির করে, তেমন লোকের বিবেকবোধ বা ন্যায়-অন্যায়ের বিচার থাকে না। সে শয়তান, বদ্ধ উন্মাদ, সে খুনী। আচ্ছা হেস্টিংস, তুমি কি অনুমান করতে পারো, সে কেন এ.বি.সি. গাইড, কেন এ্যাভোভার, আর কেনই বা মিসেস এ্যাম্বারকে বেছে নিলো? আসলে মিঃ পাত্রিজ ও মিঃ রিডেলকে খুনী সন্দেহ না করার কোনো কারণ নেই। খুনী হয়তো এ্যান্ডোভারের লোক নয়, এটা ভাবা নিষ্প্রয়োজন। এ্যান্ডোভারের লোকের কাছেও গাইড থাকে তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি।

-যদি তোমার অনুমান সত্যি হয়, আমি বলতে থাকি, তাহলে আমি একবাক্যে বলতে পারি ঐ মেদী রিডেলই হলো খুনী।

-না, সে সন্দেহের তালিকার দ্বিতীয় স্থানে আছে। লোকটা যেমন ভীতু তেমনি কাণ্ডজ্ঞানহীন। অমন লোকের পক্ষে খুন করা সম্ভব নয়। এখানে খুনী হিসেবে ধরে নেওয়া যেতে পারে পার্জিজকে। বেনামী চিঠি থেকে শুরু করে খুনের পরিকল্পনা করা সবই তার স্বপক্ষে যাচ্ছে। তবুও প্রমাণের অভাবে আমার কিছু করার নেই। হাত-পা বাঁধা, আমি ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারি, খুনী এ্যান্ডোভারের লোক নয় এবং সে যে কোন লিঙ্গের মানুষ একথাও বলতে পারি না।

পোয়ারো চুপ করে রইলো, আমিও বোবা হয়ে রইলাম। আমি তাকে বারে বারে লক্ষ করলাম। বুঝলাম, সে এই ঘটনাটা প্রায় ভুলতে বসেছে। অমি চুপ করে বসে থাকতে না পেরে প্রসঙ্গ তুলতেই সে আমার দিকে এমনভাবে দৃষ্টি হানলো যে মুখ বন্ধ না করে কোনো উপায় নেই।

আমি আপন মনে ভাবতে লাগলাম, মিসেস এ্যাস্বারের খুনকে কেন্দ্র করে এ.বি.সি.-র যে চ্যালেঞ্জ তাতে সে হেরে গেছে বলেই হয়তো এই বিষয়ের আলোচনার সূত্রপাতেই ক্ষেপে ওঠে।

আমার ইচ্ছে না থাকলেও পোয়ালরার অনুরোধে জুলাইয়ের মাঝামাঝি আমাকে ইয়র্কশায়ারে যেতে হলো। কিছুদিন ওখানে কাটিয়ে তেইশ তারিখ বিকেলে ট্রেন ধরে আমি লন্ডনে ফিরে এলাম।

চায়ের কাপ নিয়ে সবে বসেছি এমন সময় পোয়ারো এগিয়ে এসে একটি খাম আমার দিকে বাড়িয়ে দিলো।

–এটি এ.বি.সি.-র দ্বিতীয় চিঠি। পোয়ারো বললো, পড়ে দেখো।

লন্ডনে কিছুদিন না থাকার ফলে এই ব্যাপারটা প্রায় ভুলে গিয়েছিলাম। খামটা হাতে পেয়ে আমার মন নড়েচড়ে উঠলো। কাগজ, টাইপ সবই আগের মতো। কেবল চিঠির মধ্যেকার লেখাটা যা তফাত। এখানে একটা কথা চাবুকের আঘাতের মতো মনে হলো।

চিঠিটা এইরকম—

নমস্কার পোয়ারো মশাই।

ভালো আছেন তো? অবশেষে আপনি বিফল হলেন। এ্যান্ডোভারের খেলাটা দেখে নিশ্চয়ই হতবাক হয়েছেন তাই না? আপনার নিশ্চয়ই আফশোস হচ্ছে। বাজি রাখলে আপনার কাছ থেকে অনেকগুলো টাকা হাতিয়ে নেওয়া যেতো।

...অবশ্য আফশোস বললে ভুল বলা হয়। বাজি রাখার মতো সুযোগ হবে ভবিষ্যতে। গোয়েন্দাপ্রবর, একটুও বাড়িয়ে বলছি না। কলির সবে তো সন্ধে।

..আগামী পঁচিশ-তারিখ তাহলে বেক্সহিলে দুজনের দেখা হবে। সমুদ্রের ধারে খেলাটা দারুণ জমবে বলে মনে হয়।

...ভেবে আমার ভীষণ আনন্দ হচ্ছে, জানেন। আপনি উৎফুল্ল হচ্ছেন না?

ইতি বশংবদ

এ.বি.সি।

আমি চিঠিটার আদ্যোপান্ত পড়ে মন্তব্য করলাম–এ যে দেখছি, আরকেটি খুনের হুমকি।

–সেই রকমই তো মনে হচ্ছে।

পরদিন সকালে আমরা হাজির হলাম স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে। গোয়েন্দা বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার স্যার লায়নেলের ঘরে আমাদের জরুরি আলোচনা হলো, সেখানে উপস্থিত ছিলো সাসেক্সের চিফ কনস্টেবল, এ্যান্ডোভারের ইনসপেক্টর গ্লেন, সুপারিনটেনডেন্ট কার্টার জ্যাপ, ইনসপেক্টর ক্রোম এবং বিশিষ্ট মনস্তত্ত্ববিদ ডঃ টম্পসন।

দ্বিতীয় চিঠিটায় হ্যাম্পস্টেড পোস্টাফিসের স্ট্যাম্প লাগানো আছে। দুটো মেলানো হলো। দেখা গেলো একজন লোকই পাঠিয়েছে দুটো চিঠি এবং একই টাইপরাইটার মেশিনে টাইপ করা হয়েছে। চিঠি পড়ে এটা বোঝা গেল যে পঁচিশে জুলাই বেক্সহিলে আর একটি খুন অনুষ্ঠিত হবে।

পোয়ারো বললো, আমার অনুমান, খুনীর নামের পদবীর প্রথম অক্ষর ব, এটা আমার অনুমান। মিসেস এ্যাম্বারের দোকানে গিয়ে এই চিন্তা আমার মাথায় প্রথম আসে। এখন দ্বিতীয় চিঠি পড়ে আমার অনুমান ঠিক সেটা আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি।

বরং একটা কাজ করো, স্যার লায়নেল বললো, বেক্সহিলের ব পদবীধারী লোকেদের নামের একটা তালিকা তৈরি করো। সিগারেট আর খবরের কাগজ বিক্রির ছোটো দোকানগুলোর ওপর কড়া নজর রাখার ব্যবস্থা করো। অজানা অচেনা কাউকে বেক্সহিলের ধারে-কাছে দেখলে তাকে সোজা ধরে নিয়ে এসে থানায় ভরে দাও তারপর জিজ্ঞাসাবাদ করো।

–মিসেস এ্যাম্বারের খুনের ব্যাপারে যাদের সন্দেহ করা হচ্ছে তাদের মধ্যে পাত্রিজ ও রিডেল আছে। তারা যদি এ্যান্ডোভার ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে তাহলে তাদের গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হবো। গ্লেন বললো।

আলোচনা শেষ করে আমরা বাড়ির দিকে রওনা হলাম।

পথে যেতে যতে আমি বললাম, এবারের খুনটা হয়তো আটকানো যাবে।

পোয়ারো চিন্তিত মুখে আমার দিকে তাকিয়ে বললো–যেহেতু শহরসুদ্ধ লোক এই পাগলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে, তাই একথা তুমি বলছো। কিন্তু আমার তবু ভয় হচ্ছে।

-ভয়?

–হ্যাঁ, পাগলারা সব কাজ নির্দ্বিধায় করতে পারে। সেখানেই আমার ভয়।

বেশ আরামে ঘুমোচ্ছিলাম। হঠাৎ পাশ ফিরতে গিয়ে ঘুম ভেঙে গেল। দেখি পোয়ারো উৎকণ্ঠিত মুখে বসে আছে। আমি ক্যালেন্ডারের দিকে তাকালাম। আজ পঁচিশে জুলাই। এখন সকাল সাড়ে সাতটা বাজে। বন্ধুর উদ্বেগ লক্ষ্য করে আমি শেষ পর্যন্ত জানতে চাইলাম–

–তোমার কি হয়েছে, পোয়ারো?

–যা হবার তাই হয়েছে। পোয়ারোর ঠোঁট কাঁপছে। আজ ভোরের দিকে বেহিলের সমুদ্রতটে একটি মৃতদেহ পাওয়া গেছে। মৃতের নাম এলিজাবেথ বার্নার্ড। সামানেই একটি কাফেতে সে ওয়েটারের চাকরি করতো। সে ঐ শহরে বাবা-মার সঙ্গে বাস করতো। ডাক্তারি রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, রাত সাড়ে এগারোটা থেকে একটার মধ্যে কাজটা করা হয়েছে। এবারেও একটা এ.বি.সি. গাইড পাওয়া যায় মৃতদেহের কাছ থেকে।

এরপর কুড়ি মিনিটে কেটে গেল। আমরা ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। আমাদের সঙ্গে ছিলো অনেক খুনের সমাধান করে বেশ খ্যাতি লাভ করেছে সেই ইনসপেক্টর ক্রোম। যুবক বয়স। কিন্তু কথাবার্তায় বা চালচলনে একটা অহংকার লক্ষ্য করা যায়। বেশ কিছু নিজের কাজ সম্পর্কে জাহির করে বললো।-বেক্সহিলের খুনের ব্যাপারে কিছু জানার থাকলে আমি বলে দিতে পারি।

বেশ তো, মেয়েটার সম্পর্কে কিছু বলুন। পোয়ারো জানতে চাইলো।

-ওর সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানার নেই। ক্রোম বললো, বয়স হবে প্রায় তেইশ বছর। জিঞ্জার ক্যাট কাফেতে ওয়েটারের চাকরি করতো।

–তারা চেহারা?

–তাকে দেখিনি, অতএব বলতে পারবো না। ক্রোম কেমন বিরক্ত হয়ে জবাব দিলো।

মেয়েটি কিভাবে খুন হলো, সেটা কি আপনি জানেন?

–শাসরুদ্ধ করে তাকে খুন করা হয়। একটি বেল্ট যেটি তার নিজের কোমরে ছিল। সেই বেল্ট দিয়ে খুনী তার গলায় ফাঁস লাগায়।

–এই খবরটুকুর ওপর নির্ভর করে তদন্ত অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। পোয়ারো মন্তব্য করলো।

–কিভাবে? ক্রোম হতভম্ব হয়ে প্রশ্ন করলো।

-এটা তো না বোঝার কিছু নেই, আমি বললাম। একনম্বরের বদমাস না হলে কেউ কখনো কারো গলায় বেল্ট জড়িয়ে দমবন্ধ করে মারতে পারে? আমি পোয়ারোর দিকে তাকালাম।

পোয়ারো আমাকে ইঙ্গিতে চুপ করতে বললো। আমি কথা না বাড়িয়ে থেমে গেলাম।

ওখানে পৌঁছানোর পর কার্টারের কাছে জানতে পারলাম, মেয়েটির বাবা এই ঘটনায় ভীষণভাবে ভেঙে পড়েছে। তাই জিজ্ঞাসাবাদ আপাতত করা যাচ্ছে না।

-বাবা-মা ছাড়া মেয়েটির আর কোনো আত্মীয় আছে? পোয়ারো জানতে চাইলো।

-হ্যাঁ, এক বোন আছে। লন্ডনে থাকে। কোনো এক অপিসে টাইপিস্টের কাজ করে। আত্মীয়ের মধ্যে আর এক যুবক ছিল, যার সঙ্গে গতকাল রাতে ওর দেখা করার কথা ছিল। কার্টার জানালো।

সুযোগ বুঝে ক্রোম প্রশ্ন করলো, এ.বি.সি. গাইড থেকে কি কিছু পাওয়া গেছে?

-না, কেবল মৃতদেহের পাশে ওটি ভোলা অবস্থায় পড়ে ছিল। যে পৃষ্ঠা খোলা ছিল সেটিতে বেক্সহিলে যাতায়াত করার ট্রেনের সময় তালিকা ছিল। গাইডটা একেবারে নতুন। কাছাকাছি দোকানদারদের থেকে জানা গেছে এই বই এখান থেকে বিক্রি হয়নি।

-মৃতদেহটি আবিষ্কার করে কর্নেল জেরোম। প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে নজরে পড়ে এবং পাশের হোটেল থেকে থানায় ফোন করে সব কিছু জানায়। আমরা এত সকালে কারো সঙ্গে তখনও কথা বলতে পারিনি।

পোয়ারো ক্রোমকে সঙ্গে না নেওয়ায় সে মনে মনে একটু অপমানিত বোধ করে। একটু বাঁকা হাসি হেসে বললো–স্যার, আপনি বরং মিঃ পোয়ারোকে বেল্টটা দেখিয়ে দিন। ওটা নাকি ওঁর কাছে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। দেখি, উনি কী এমন তথ্য আবিষ্কার করেন। আসলে বেল্ট থেকে হাতের ছাপ আপনি পাবেন না। ওটা সিঙ্কের, চামড়ার নয়।

আমরা জিঞ্জার ক্যাট কাফেতে গিয়ে ঢুকলাম। ঐ কাফেটি চালনা করে মিস মেরিয়ান। সস্তাদামের কিছু কাপড় দিয়ে ঢাকা কতকগুলো বেতের চেয়ার ছাড়া আর কিছু নজরে পড়লো না। কেমন যেন চাকচিক্যহীন। আমরা কাফের মালকানর সঙ্গে দেখা করে আসার কারণ জানালাম।

জানেন, আমাদের কত ক্ষতি হলো, মিস মেরিয়ন রেগে কই। কোনো খদ্দেরই এই দোকানে ঢুকবে না।

আপনার দোকানে মিস বার্নার্ড কতদিন চাকরি করছে? ওর স্বভাব কেমন? ক্রোম জানতে চাইলো।

এখানে প্রায় বছর খানেক ও কাজ করছে। বেশ চালাক, কাজেকর্মে বেশ চটপটে ছিল। তবে ওর চরিত্র সম্পর্কে আমার কিছু জানা নেই। কারণ দোকান সামলে ও সব দিকে নজর দেওয়ার অবসর আমার হত না।

–মেয়েটি দেখতে কেমন ছিল?

পোয়ারোর প্রশ্ন শুনে মিস মেরিয়ান ও ক্রোম একসঙ্গে তার দিকে তাকালো।

মেরিয়ান তারপর চোখ ঘুরিয়ে বললো, ভালোই, খারাপ নয়।

-কাল কত রাতে সে এখান থেকে বেরিয়েছিল? ক্রোম প্রশ্ন করলো।

–ছটার সময় দোকানে ভীষণ ভিড় হয়। খদ্দেরদের ঝামেলা মিটিয়ে আমরা প্রায় দেড় ঘণ্টা দোকান খুলে রাখি। তারপর দোকান বন্ধ হয়। বার্নার্ড অন্যান্য দিনের মতো আটটা নাগাদ দোকান বন্ধ করে চলে যায়।

-কোথায় যাচ্ছে, আপনাকে বলেছিল?

–না।

–দোকানে থাকাকালীন বাইরের কেউ তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলো?

–না।

–ও কি আপনার মাস মাইনের কর্মচারী ছিল?

–হ্যাঁ, ও আর হিগলি।

–আমরা একটু হিগলির সঙ্গে কথা বলতে চাই।

–বেশ বলুন, তাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, তবে বেশি সময় নেবেন না।

পঁচিশ বছরের এক যুবতী আমাদের সামনে হাজির হলো। চোখে-মুখে ভয়ের ছাপ-

–তুমি মিস বার্নার্ডকে চিনতে?

-হ্যাঁ, আমি ভাবতেই পারছি না যে এভাবে ওর মৃত্যু হয়েছে। অত্যন্ত শান্ত ও মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে ছিল।

২. মিস বার্নার্ড সম্পর্কে

মিস বার্নার্ড সম্পর্কে নতুন কিছু মিস হিগলির কাছ থেকে জানা গেল না। মিস মেরিয়ানের কথারই পুনরাবৃত্তি হলো মিস হিগলির কণ্ঠে। তবে হিগলি জানালো যে মাত্র চার মাস বার্নার্ড কাজে যোগ দিয়েছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করার সুযোগ হয়ে ওঠেনি। তবে একটা যুবক তার পেছন পেছন ঘুরতো। ছেলেটির সঙ্গে ওর প্রেম ছিল। ছেলেটি নাকি কোনো রিসিভারের দোকানে কেরানীর পদে কাজ করে। ছেলেটি দেখতে ভালো এবং চটপটে।

ঘটনার রাত্রে বার্নার্ড কাউকে কিছু না বললেও এইরকম আভাস দিয়েছিল।

আমরা কাফে থেকে বেরিয়ে মৃতার বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম। মিঃ বার্নার্ড আমাদের বসার ঘরে নিয়ে গেলো। আমাদের সঙ্গে তার পরিচয় পর্ব শেষ করলাম। বার্নার্ডের স্ত্রী স্বামীর পাশে বসে কাঁদতে লাগলো। মিঃ বার্নার্ড তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলো। জানালো মেয়ের মৃত্যুতে ভীষণভাবে মুষড়ে পড়েছে।

মিঃ ক্রোম গলা ঝেড়ে নিয়ে নিজেকে তৈরি করলো। তারপর মিঃ বার্নার্ডের উদ্দেশ্যে বললো–আপনাদের এই বাড়িটা কি নতুন?

হ্যাঁ, আগে আমরা কেনিংটনে থাকতাম। সেখানে আমাদের ঢালাই-এর ব্যাবসা ছিল। ব্যাবসা ধীরে ধীরে মন্দা হয়ে যাওয়ায় সব বিক্রি করে দিয়ে এই সমুদ্রের তীরে এসে বসবাস শুরু করি। সমুদ্রের ধার আমার খুব প্রিয়।

কাল রাতে তো আপনার মেয়ে বাড়ি ফেরেনি, আপনার সেজন্য চিন্তা হয়নি?

–রাত নটার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়ে পড়া আমাদের অভ্যাস–মিসেস বার্নার্ড জবাব দিলো। আমরা অন্যান্য দিনের মতো তাই করেছিলাম। পুলিশ সকালে না এসে জানালে আমরা কিছু জানতে পারতাম না। মেয়ে আমার এগারোটা নাগাদ ফিরতো।

–ওর জন্য কি দরজা খোলা থাকতো?

–হা দরজা খোলা থাকতো, কার্পেটের নিচে চাবি থাকতো।

–আপনার মেয়ের নাকি বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেছে?

হতে পারে। কারণ মেয়েরা বড় হয়ে গেলে আজকাল নিজের পাত্র নিজে ঠিক করে নিয়ে বিয়ে করে। ও হয়তো তাই করতো।

মিসেস বার্নার্ড জানালেন–আমি জানতাম, ছেলেটির নাম ডোনাল্ড ফ্রেসার। সে-ও হয়তো ভীষণ আঘাত পেয়েছে এই ঘটনায়। চমৎকার দেখতে। পোর্ট এ্যান্ড ব্রান্সকিল অফিসে ছেলেটি চাকরি করে। সপ্তাহে দুদিন সে এলিজাবেথের সঙ্গে দেখা করতে।

–আপনি কি জানেন, কাল তার সঙ্গে আপনার মেয়ের দেখা করার কথা ছিল কিনা?

–না, ভারী সরল ও খেয়ালী মেয়ে ছিল। আমাকে খুব ভালোবাসতো।

-ওর মাকে ও ভীষণ বিশ্বাস করতো-খানিকটা দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে মিঃ বার্নার্ড জানালো, আমার ওপর ভরসা করতো না। তাই আমাদের মধ্যে একটা বড় দূরত্ব ছিল।

-ওর ঘরখানা একবার দেখাবেন?

আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো এলিজাবেথের ঘরে। সবার শেষে আমি ছিলাম। জুতোর ফিতে খুলে যাওয়াতে আমি ওদের থেকে একটু পিছিয়ে পড়লাম। ঠিক সেই সময় ট্যাক্সি থেকে একটা মেয়ে নেমে এলো সোজা আমার কাছে। আমাকে প্রশ্ন করলো

–আপনি কে?

আমি চট করে জবাব দিতে পারলাম না। কারণ নিজের পরিচয় দেওয়া বারণ, আবার পুলিশের লোক বলে নিজেকে জাহির করা যাবে না। তাই চুপ করে রইলাম।

মেয়েটি বললো-বুঝেছি, আর বলার প্রয়োজন নেই।

আমি বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্নের ধাপ কাটিয়ে তাকে প্রশ্ন করলাম–আপনি মিস বার্নার্ড, তাই না?

–হ্যাঁ, আমার নাম মেগান বার্নার্ড, ওর মতো মেয়ে হয় না। পুরুষ বন্ধু ওর ছিল না।

আমি সাংবাদিক বা পুলিশ নই জানতে পেরে আমাকে আবার প্রশ্ন করলো,–তাহলে আপনি কে? আমার বাবা-মা কোথায়?

–আপনার বাবা-মা আপনার বোনের ঘর দেখতে গেছে।

তারপর সে কি ভেবে আমাকে ইশারা করলো। আমি তার পেছনে পেছনে এগোলাম। আমরা রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলাম। সে আমাকে দরজা বন্ধ করে দিতে বললো। দরজা বন্ধ করতে গিয়ে বাধা পেলাম। বাইরে থেকে দরজা ঠেলে পোয়ারো এসে ঢুকলো। এরপর আমি দরজা বন্ধ করে দিলাম।

পোয়ারো মেগানের সামনে এগিয়ে গেলো। মাথা ঝাঁকিয়ে স্মিত হেসে বললো-সুপ্রভাত মাদমোয়াজেল।

আমি মেয়েটির পোয়ারোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম। দেখলাম তার ঠোঁটে এক তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠলো।

-আপনিই সেই বিখ্যাত ডিটেকটিভ পোয়ারো?

পোয়ারো বললো, মাদমোয়াজেল, আপনাদের এই নশ্বর পৃথিবীতে মৃত্যুর একটা আলাদা চেহারা আমি দেখেছি। আমি আপনার সব কথা শুনেছি। মানুষের মৃত্যুর পর তার সম্পর্কে সকলেই ভালো ভালো কথা বলে। অতএব আমি সেসব নতুন করে জানতে চাই না। আমি এমন একজনকে এখন চাই যে এলিজাবেথ বার্নার্ডকে জানে বা জানে সে মারা গেছে। এরকম কাউকে পেলে আমি হয়তো সত্যের মুখোমুখি হতে পারবো।

কয়েক মুহূর্ত নীরবতায় কেটে গেল। একসময় মেগান বলে উঠলো,-বেটি একটা বোকা, একটা অপদার্থ, একটা আস্ত গর্দভ।

মেগানের এ ধরনের মন্তব্য শুনে আমি বোকা বনে গেলাম। পোয়ারোর মধ্যে কোনো পরিবর্তন দেখতে পেলাম না।

মেগান তখনও বলে চলেছে, সে ভালো হলেই দোষ ছিল। তার চরিত্র সংশোধন করতে বলেছিলাম, কিন্তু তা করেনি।

–কিন্তু মাদমোয়াজেল, পোয়ারো বলল, আপনি হেস্টিংসকে বলেছেন আপনার বোনের কোনো ছেলে বন্ধু ছিল না। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। বরং আপনার কথার উল্টোটাই সে ছিল।

-হ্যাঁ, সেটা ঠিকই বলেছেন, সে ভালোমন্দের ধার ধারতো না। কেউ একটু আদর করে কথা বললে একেবারে গলে যেতো। হৈ-হুল্লোড় পছন্দ করতো।

নিশ্চয়ই সুন্দরী ছিল, তাই না?

সকাল থেকে এই একই প্রশ্নের উত্তর পোয়ারো তিনবার জানতে চেয়েছিল, দুবারে কোনো জবাব পায়নি। এবারে কাজ হলো। মেগান তার বোনের একটা ছবি আমাদের দেখালো। আহামরি এমন কিছু নয়, তবে চমকে দেওয়ার মতো মুখ।

-আপনার সঙ্গে আপনার বোনের কোনো সাদৃশ্য নেই। পোয়ারো বললো।

–না, আমার চরম শত্রুও আমাকে সুন্দরী বলে না। হেসে জবাব দিল মেগান।

–আপনার বোন কি ধরনের বোকামি করেছিল? যদি তার বন্ধুটির সম্পর্কে আমাদের কিছু জানান?

-হ্যাঁ, ডন শান্ত স্বভাবের ছেলে। কোনো ঝুট-ঝামেলা পছন্দ করে না। বেটির কোনো ব্যাপারে সে নাক গলাতো না। তবে অতিরিক্ত হয়ে গেল...।

-তারপর? অতিরিক্ত হয়ে গেলে...।

-জানেন তো, অতিরিক্ত কিছু হলে বিশ বছরের পুরানো প্রেমেও ভাঙন ধরে। ডনের সঙ্গে বেটির বিচ্ছেদ ঘটেছে সেটা আমি অনুমানে বুঝতে পারি। ও যদি নিজেকে সংশোধন করতে তাহলে ডন দুমাসের মধ্যে তাকে বিয়ে করতো। এর বেশি কিছু আমি বলতে পারবো না।

মেগান চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়ালো। পোয়ারোর কথা শুনে থমকে দাঁড়ালো।

–আপনাকে একটা কথা বলি। এই বলে পোয়ারো তাকে এ.বি.সি.-র বেনামী চিঠি পাওয়া থেকে এ্যান্ডোভারের খুন, দ্বিতীয় চিঠি সব ঘটনা বিস্তারিত জানালো।

মেগান আগ্রহী হয়ে জিজ্ঞাসা করলো–আপনার কথা কি সব সত্যি? তাহলে আপনি কি বলেন ঐ বদ্ধ উন্মাদটা বোনকে খুন করেছে?

–হ্যাঁ, আমার ধারণা তাই। আপনি যদি আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন। সব খুলে বলেন তাহলে আমাদের কাজের সুবিধা হয়। এখানে আসার গুরুত্বটা আপনি নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারেছেন।

–বেশ শুনুন, আগেই বলেছি, ডন শান্ত ছেলে। বেটিকে প্রাণের থেকেও বেশি ভালোবাসতো। সে একটা চাপা স্বভাবের ছিলো। মনের মধ্যে সব কিছু চেপে রাখতো, মুখে প্রকাশ করতো না। বেটির বেপরোয়া চালচলনকে সে মেনে নিতে পারতো না। কিন্তু বেটির সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ ছিল না। ডনকে সে কোনোদিন বুঝতে চায়নি। কেবল বলতো, বিয়ের পর তো বন্দি হয়ে যাবো। তার আগে মনের সুখে ফুর্তি করে নিই। তার এই উচ্ছলতা আরো বেড়ে গেল জিঞ্জার ক্যাটে চাকরি পাওয়ার পর। অফুরন্ত সুযোগ, যাদের সঙ্গে ওখানে ওর আলাপ হতো, তাদের পেছন পেছন সে ছুটতো।...এইভাবে চলছিলো। তারপর শুরু হলো ভুল বোঝাবুঝি, দোষারোপ ইত্যাদি।

...জানেন তো, শান্ত লোক একদিকে ভীষণ ভালো, কিন্তু তারা ক্ষেপে গেলে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। ঠিক সেরকমটি ডনের ক্ষেত্রেও ঘটলো। এই তো কয়েকমাস আগের কথা, আমি ওদের দুজনকে ডেকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সব কিছু মিটমাট করে দিলাম। বেটি কোনো কিছু মানতে নারাজ। কেবল একই কথা : কি এমন অন্যায় করেছি। আসলে দোষ ছিল বেটির। সে ডনকে বলেছিল, হেস্টিংসে এক বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করতে যাবে। কিন্তু সে মিথ্যে কথা বলেছিল। কিন্তু সেদিন বিকেলে তাকে দেখা গেল একজন বয়স্ক লোকের হাত ধরে সমুদ্রের ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ব্যাস, ডানের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটলো। আসলে ঐ লোকটার বাড়িতে ছেলে-বৌ আছে। এক শয়তান, চরিত্রের ঠিক নেই, লম্পট। ডন ঐ দৃশ্য দেখে রেগে যায় ভয়ঙ্করভাবে। বেটিকে বলেছিল,

একদিন না একদিন তার হাতে বেটি খুন হবে।...তবে আমি একথা বিশ্বাস করি না। সে বড় জোড় কয়েকবার ঝগড়া করতে পারতো। তাই বলে..অবশ্য রাগের মাথায়...।

হা, অসম্ভব কিছু নয়। আচ্ছা আপনার বোন কি সেই লোকটির সঙ্গে পরে কখনো দেখো করতো?

-আমি বলতে পারবো না। কারণ আমি তো এখানে থাকি না। তবে দেখা করলেও করতে পারে। ওর একটা দোষ ছিল, একজনকে নিয়ে ও বেশিদিন খুশী থাকতো না। ও আমাকে ওর মনের কথা সব বলতো, অন্য কাউকে নয়।

হঠাৎ বাইরে থেকে ভেসে এলো একটা গলার আওয়াজ–ডন এসেছে।

ইনসপেক্টর যাতে তাকে আক্রমণ না করে তাই আগেভাগে পোয়ারো মেগানকে ওকে নিয়ে আসতে বললো।

সুদর্শন যুবক। প্রেমিকার মৃত্যুতে ভীষণভাবে আঘাত পেয়েছে, তা তার মুখ দেখে বোঝ গেল। ফ্রেসার মেগানকে উদ্দেশ্য করে বললো–কি মেগান। তাড়াতাড়ি চল। আমি যা শুনে চললাম...বেটি...।

পোয়ারো তাকে মন দিয়ে লক্ষ্য করছিল। ওর বিচলিত ভাব দেখে সে ফ্রেসারকে চেয়ারে বসতে বললো। তারপর নিজের পকেট থেকে ব্র্যান্ডির শিশি বের করে তার দিকে এগিয়ে দিলো। বাচ্চা ছেলের মতো সে কিছুটা ব্র্যান্ডি গলায় ঢেলে দিয়ে শিশিটা ফেরত দিলো। কিছুক্ষণের মধ্যে সে চাঙ্গা হয়ে উঠলো।

-তাহলে কি আমার বেটি সত্যিই খুন হয়েছে? সে বললো।

–হ্যাঁ।

–বাবার ফোন পেয়েই আমি লন্ডন থেকে চলে এলোম।

–নটা কুড়ির গাড়িতে এলে বুঝি?

নিজের উদ্বেগ চাপতে সে যে কি বলবে ভেবে পোলো না। বিক্ষিপ্তভাবে বলে উঠলো, পুলিশ এসেছে? কি করছে? ধরতে পেরেছে? হঠাৎ আমাদের দিকে এমনভাবে তাকালো যে মেগান ছাড়া ঘরে যে আমরা দুজন উপস্থিত আছি সে এতক্ষণ সেটা টের পায়নি।

-মঁসিয়ে ফ্রেসার, সময় নষ্ট না করে পোয়ারো কাজের কথায় এলো, কাল রাতে মিস বার্নার্ড কোথায় যাবেন, আপনাকে কি বলেছিলেন?

হা, বলেছিলো, সেন্ট লিওনার্ডে ওর নাকি এক বান্ধবী থাকে, তার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার কথা ছিল।

-তার কথা সত্যি বলে আপনি কি মেনে নিয়েছিলেন?

–বুঝলাম না, আপনি কি বলতে চাইছেন?

–কিছু না, কেবল সত্যিটা জানতে চাই। মিস বার্নার্ড যে এক বদ্ধ উন্মাদের হাতে খুন হয়েছে, আশা করি আপনি তা জানেন না।

-ভয় নেই, মেগান ফ্রেসারকে লক্ষ্য করে বললো, সব কথা ওদের খুলে জানাও। ওরা ডিটেকটিভ। সত্যকে আবিষ্কার করা ওদের কাজ।

–প্রথমে ওর কথা বিশ্বাস করেছিলাম, ফ্রেসার আশ্বাস পেয়ে বলতে থাকে। কিন্তু পরে মনের মধ্যে কেমন যেন সন্দেহ দানা বেঁধে উঠলো। তাই আগু-পিছু না ভেবে সন্ধেবেলা জিঞ্জার ক্যাটের ধারে-কাছে ঘুর ঘুর করতে শুরু করলাম। বেটি দোকান বন্ধ করে বেরোলো। আমি নিঃশব্দে তার পেছন ধরলাম। কিন্তু বেশিদূর এগোতে পারলাম না। মনে মনে ভাবলাম যদি বেটি টের পায় আমি তার পিছু নিয়েছি তাহলে ভীষণ দুঃখ পাবে। অতএব ওখান থেকে আমি চলে এলোম। কিন্তু এসেও আমি স্থির থাকতে পারলাম না। সন্দেহের খোঁচা আমাকে পাগল করে তুললো। অগত্যা সেন্ট লিওনার্ডে আটটা নাগাদ পৌঁছালাম। বাস, ট্যাক্সি, টাঙ্গা, টমটম, সব দেখলাম, কিন্তু বেটিকে দেখতে পেলাম না।

আমার বুঝতে দেরি হলো না। সে আমাকে সত্যিই মিথ্যে বলেছে। তাহলে কি ঐ বুড়োটার সঙ্গে ঘুরছে। কিন্তু সেদিনের পর থেকে ইস্টবোনে তাকে কোনোদিন পা দিতে দেখিনি। তাহলে সে গেল কোথায়? হেস্টিংসেও যেতে পারে ভেবে সেদিকে ছুটলাম। সব জায়গায় তার খোঁজ করলাম। পেলাম না। কূলকিনারা কিছু ভেবে না পেয়ে আমি আপন মনে নির্জন রাস্তা দিয়ে হেঁটে ফিরেছিলাম। তখন রাত বারোটা কি সাড়ে বারোটা হবে।

এরপর ঘরে এসে ঢুকলো ক্রোম, কেলসি। পোয়ারো ওদের সঙ্গে মেগানের এবং ফ্রেসারের পরিচয় করিয়ে দিলো। তারপর পোয়ারো ঘর থেকে বেরিয়ে এলো, আমিও তাকে অনুসরণ করলাম।

আমি তার চিন্তিত মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম–কি ভাবছো, বন্ধু?

–ভাবছি...ভাবছি, কি আশ্চর্য মহানুভব আমাদের এই খুনী।

স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে আবার বেক্সহিলের খুন নিয়ে গোল মিটিং শুরু হয়েছে। লক্ষ্য করলাম, মিসেস এ্যাম্বারের চেয়ে বেটি বার্নার্ডের খুন বেশি গুরুত্ব পেয়েছে এখানে। হয়তো মেয়েটি যুবতী এবং অবিবাহিতা বলে সবাই বেশি মাথা ঘামাচ্ছে। চারদিকের সমার্লোচনার ঝামেলায় জর্জরিত হয়ে স্যার লায়নেলকে বৈঠকে ডাকা হয়েছে।

সে বললো–পরিস্থিতি যেমন দাঁড়িয়েছে তাতে সর্বসাধারণকে জানিয়ে দেওয়া উচিত যে-কোনো অবস্থায় ঐ বদ্ধ পাগলটার খবর পেলে...

কথার মাঝখানে টম্পসন বলে উঠলো...তার আগে আমাদের ভালো করে জানতে হবে খুনী আসলে অদ্ভুত না কি আমাদের মতো সাধারণ।

-নতুন কিছু না ঘটা পর্যন্ত আমাদের চুপ করে থাকা উচিত। ক্রোম মন্তব্য করলো।

ক্রোমের কথায় পোয়ারো সমর্থন করলো। প্রচার হলে হয়তো তৃতীয় খুন আবার অনুষ্ঠিত হবে।

-কিন্তু মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনি হয়তো খুনীর মনস্তত্ত্বটা বুঝে উঠতে পারেননি। ক্রোম বললো, তাই এখানে অসুবিধা হচ্ছে। পৃথিবীর সেরা চালাক লোক হিসাবে খুনী নিজেকে মনে করে। তাই একের পর এক খুন করে শেষ রক্ষা করতে পারে না।

-বেক্সহিলে তদন্ত করে কিছু আবিষ্কার করেছেন আপনি? পোয়ারো ক্রোমের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলো।

না, বিশেষ কিছু নয়। নিছক কয়েকটা খবর মাত্র। ইস্টবোনের স্ পেলম ডাইভ রেস্তরাঁর এক বেয়ারা মেয়েটির ছবি দেখে চিনতে পারলো।

সে জানিয়েছে, ঘটনার দিন রাতে মেয়েটির সঙ্গে একজন মধ্যবয়স্ক চশমাওয়ালা ভদ্রলোক ছিল। তারা একসঙ্গে ডিনার করেছে। বেক্সহিল ও লন্ডনের মাঝামাঝি এক চায়ের দোকানের মালিকও ঐ একই কথা জানিয়েছে। ভদ্রলোককে দেখে তার মনে হয়েছিল, নিশ্চয়ই সে জাহাজের অফিসার অথবা ঐ ধরনের কিছু। অতএব দুজনের কথার মধ্যে সাদৃশ্য আছে একটা–ঘটনার রাতে বেটি বার্নার্ডের একজন সঙ্গী ছিলো এবং আমাদের ধারণা যদি ঠিক হয়, তাহলে ঐ সঙ্গীটিই হলো তার খুনী।

পোয়ারো নীচু কণ্ঠে বলে উঠলো, আমাদের সর্বপ্রথম খুনের মোটিভ জানতে হবে। তাহলে সূত্রের সন্ধান পেতে অসুবিধা হবে না।

-মোটিভ তো জলের মতো পরিষ্কার।

বর্গমালার ব্যাপারটা হয় যে কোনো প্রকারে তার মাথায় ঢুকে গেছে, তাই এটাকে নিয়ে সে ক্ষেপে উঠেছে। আসলে খুনী একজন বিকারগ্রস্ত লোক। সে মোটেও সুস্থ নয়। বিবেকবুদ্ধিহীন বদ্ধ উন্মাদ।

কিন্তু বিকারের ঘোরেনা, সে যা করে সবকিছুর পেছনে তার অবচেতন মনে একটা যুক্তি, একটা কারণ থেকে যায়।

মাথা নেড়ে ক্রোম সায় দিল।

–যুক্তি থাকতেই হবে এমন কোনো মানে নেই। ১৯২৯-এ সেই স্টোনম্যান যে কোনো যুক্তির তোয়াক্কা করতো না। তাকে কেউ বিরক্ত করলে সে তাকে ঘৃণা করতো।

কিন্তু এখানে একটা কারণ আছে। বিরাট এক সূত্রের চিরন্তন ব্যবধান, যেমন ধরুন কোনো মাছি বা মশা দুবার আপনাকে বিরক্ত করলে আপনি কি তিনবারের পর তাকে মেরে ফেলবেন। এখানে মাছি আর আপনার মধ্যে ক্ষুদ্র-বৃহতের একটা প্রাচীর আছে। স্টোনম্যানের নাম কে না জানতো। সে কোনো ক্ষুদ্র ব্যক্তির বেয়াদপি সহ্য করতো না। তাই সে নির্দ্বিধায় খুন করতো।

পোয়ারোর বিশ্লেষণ শুনে টম্পসন খুশী হলো। বললো–আপনার কথা অনুযায়ী বলা যায়, খুনীর যখন মাথায় খুন চাপে তখন সে কোনো কিছু তোয়াক্কা করে না। একের পর এক লোককে হত্যা করে সে পরিতৃপ্তি লাভ করে। কিন্তু এখানে একটু ব্যতিক্রম আছে। ঐ চিরাচরিত নিয়ম প্রযোজ্য নয়। অবশ্য খুনির উদ্দেশ্য যদি যৌন বিকার হয় তাহলে স্বতন্ত্র

ব্যাপার। যে দুজন খুন হয়েছে তারা দুজনেই মহিলা। তাই এখনই কোনো সিদ্ধান্তে না পৌঁছিয়ে পরবর্তী।

পোয়ারো ইতস্ততঃ করে বললো, এটাকে আমি পাগলামি বা ফাজলামি বলে মনে করি না। অবশ্য সম্পূর্ণ ব্যাপারটা এখনও আমার কাছে আবছা কুয়াশায় ভরা। প্রতিটি খুনের আগে এরকুল পোয়ারোর নামে সে তীব্র শ্লেষ, চ্যালেঞ্জের প্রছন্ন আহ্বান জানিয়েছে। তবে...তবে কি তার আক্রোশ আমার ওপর? আমি কি জ্ঞানে বা অজ্ঞানে তার কোনো ক্ষতি করেছি। তাই কি সে একের পর এক খুন করে গায়ের জ্বাল মেটাচ্ছে? অথবা, আমাকে পছন্দ করে না, আমি বিদেশী বলে এর কারণ কি?

–আপনার কথাগুলো খুব তাৎপর্যপূর্ণ। টম্পসন বললো।

ঝট করে ক্রোম বলে উঠলো–কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রশ্নগুলোর কোনো উত্তর নেই। তার কথায় কেমন ব্যঙ্গ লক্ষ্য করা গেল।

–ঠিক বলেছেন, এই প্রশ্নগুলোর মধ্যে আমার রহস্যের সমাধান লুকিয়ে আছে। পোয়ারো ক্রোমের কথার জের টেনে বললো। যদি এই প্রশ্নগুলির কোনো একটির জবাব আমার জানা থাকতো তাহলে খুনীর তৃতীয় শিকারের নাম-ধাম জানতে আমার বেগ পেতে হতো না। তবে খুনী যে মহান, উদার সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। একটা জিনিস লক্ষ্য করুন, মিসেস এ্যাস্বারের খুনের সঙ্গে তার স্বামীকে জড়িয়ে ফেলা হলো, আবার বেটি বার্নার্ডের হত্যাকারী হিসেবে স্বাবাবিক ভাবেই ডোনাল্ড ফ্রেসারের নাম চলে আসছে। কিন্তু তাদের কাউকে গ্রেপ্তার করা হলো না। এর কারণ কি? এর মূলে আছে ঐ বেনামী চিঠি

দুটি। সে চিঠিতে তার অপরাধের কথা স্বীকার করেছে। সে তার অপরাধের বোঝা অন্য কারোর ঘাড়ে চাপাতে চায় না। এটাই তার মহৎ মনের প্রমাণ।

-তাহলে পরের চিঠি পাওয়া পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করি। ক্রোম বললো। তারপরেই আমরা জনসাধারণের কাছে সব প্রকাশ করবো। এর ফলে সমস্ত মানুষ সর্বদা সচকিত থাকবে। আততায়ী যখন তার কাজ হাসিল করতে যাবে তখন স্বাভাবিকভাবে হাতেনাতে ধরা পড়বে।

অবশেষে তিন নম্বরে চিঠি হাজির হলো। বার্নার্ডের ঘটনার পর থেকে স্যার লায়নেলের হুকুমে পোয়রোর দরজায় চব্বিশ ঘণ্টা পাহারার ব্যবস্থা হলো। আমরা যখন বাড়ির বাইরে যাই তখন সার্জেন্টটি বেশি সতর্ক থাকে, কারণ খুনীর তৃতীয় চিঠিটা আসার সেই মুহূর্তেই উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে যাবে দেরি না হয়। আমাদের অনুপস্থিতিতে আমাদের চিঠি সে খুলে পড়তে পারে। এমন নির্দেশ তার ওপর দেওয়া আছে।

শুক্রবার দশটা নাগাদ দিনের শেষ এবং পঞ্চম ডাক এলো। পাঁচটা চিঠি নিয়ে আমি দেখতে লাগলাম, শেষ চিঠিটার দিকে তাকিয়ে আমি অস্ফুটে চেঁচিয়ে উঠলাম।

–পোয়ারো।

আমার বন্ধু তখন চোখ বুঝে চিন্তায় মগ্ন ছিলো। আমাদের কণ্ঠস্বরে সে চোখ খুলে স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো, এসেছে নাকি? খুলে ফেলল। পড়ো।

আমি দেরি না করে চিঠিটা পড়তে শুরু করলাম।

বেচারা পোয়ারো,

বলুন তো, আমার এই দুঃখ আমি কোথায় রাখি। আপনি একজন স্বনামধন্য ডিটেকটিভ। বারে বারে এমন ব্যর্থতা। ছি ছি, ভাবতেও আমার লজ্জা লাগছে। আমি যদি আগে জানতাম, তাহলে এমন ক্ষুদ্র ব্যাপারে আপনাকে জড়াতাম না।

তা, দু-দুটো খেলায় আপনি হেরে গিয়ে বেশ ভুঝতে পারছনে, আপনার বুদ্ধি কতখানি। এবার আর একটা খেলা খেলবো আপনার সঙ্গে। তবে সেটা সহজ সরল সাদামাটা গোছের খেলা। জটিল খেলায় খেলতে নামিয়ে লাভ নেই।

...তিরিশে, হ্যাঁ, তারিখটা ভুলবেন না। এ মাসের তিরিশ তারিখে কার্স্টনে হবে খেলাটা। দেখুন আপনি এবার জিততে পারেন কি না। স্বীকার করতে দোষ নেই, আমার নিজেরও কেমন খারাপ লাগছে। নিজের খেলায় বার বার নিজেই অনায়াসে জিতে যাবো...তা কি কখনো কারো ভালো লাগে বলুন।

...আমি ঈশ্বরের কাছে আপনার শুভ কামনা প্রার্থনা করছি।

ইতি

বশংবদ

এ.বি.সি

কবে চিঠিটা লেখা হয়েছে, সেটা দেখো আর কবে খুন হবে? পোয়ারো আমাকে বললো।

–সাতাশে আগস্ট চিঠিটা লেখা হয়েছে। খুন হবে তিরিশ আগস্ট।

-তাহলে তো আজই খুন হওয়ার কথা। সে মেঝে থেকে চিঠিটা তুলে নিয়ে ভালো করে দেখে বললো-ই, ঠিকানাটা ভুল লেখা হয়েছে, হবে হোয়াইট হাউস ম্যানসন, তার পরিবর্তে বসানো হয়েছে হোয়াইট হর্স ম্যানসন। যাতে ডাকবিভাগ নাকানি-চোবানি খেয়েছে। তিনদিনে চিঠিটা পেলাম, হেস্টিংস, তুমি বরং এক কাজ করো, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে ফোন করে চিঠির ব্যাপারটা এক্ষুণি জানিয়ে দাও। সত্যি আমাদের ভীষণ দেরি হয়ে গেল। এখন দশটা বেজে কুড়ি। তার মানে হাতে আমাদের এক ঘন্টা চল্লিশ মিনিট ময় আছে। হেস্টিংস দেখ তো, কান জায়গাটা ঠিক কোথায়?

জায়গাটা ডিভনের উপকূলবর্তী। ছোট্ট একটা গ্রাম। প্যাডিংটন থেকে দুশো চার মাইল ভেতরে। জনসংখ্যা পাঁচশো চুয়াল্লিশ।

জায়গার বর্ণনা শুনে পোয়ারো বললো–যাক, একটু নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। এত লোকের মধ্যে একটা আনাড়ি লোকের আবির্ভাব হলে কারো না কারো নজরে ঠিকই পড়বে। অতএব তার চেহারার বর্ণনা হয়তো আমরা তাদের কাছ থেকে পেতে পারি। একটু চুপ করে থেকে আবার বললো, দুশো চার মাইল রাস্তা গাড়ির চেয়ে ট্রেনেই ভালো। তুমি দেখ তো, কাস্টন যাওয়ার রাতের কোনো ট্রেন আছে কিনা?

-প্যাডিংটন থেকে ঠিক বারোটায় ট্রেন। নিউটন এ্যাবাট পৌঁছবে ছটা পাঁচে। সাতটা পনেরো নাগাদ ট্রেন হাজির হবে কানে।

-চলো বেরিয়ে পড়া যাক। তুমি তৈরি হয়ে নাও, আমি ততক্ষণ ক্রোমকে একটা ফোন করি। ফোন করে সে পিরে এসে জানালো, ক্রোমও আমাদের সঙ্গী হচ্ছে।

স্টেশনে ক্রোমের সঙ্গে আমরা মিলিত হলাম। সে জানালো, কানের সমস্ত সিঅক্ষরধারী নাম পদবীধারী মানুষকে সতর্ক করে দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে শেষ পর্যন্ত সব দিক রক্ষা হলেই ভালো।

চিঠিটা ক্রোমকে দেখানো হলো। সে বললো–যদি চিঠিটা সময়মতো এসে পৌঁছোত তাহলে শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা ভালোভাবে করা যেতো।

-যদি সে ইচ্ছা করেই ঠিকানাটা ভুল লেখে? আমি জানতে চাইলাম।

-না না, ভুল সে করবে না। নিয়মের ব্যতিক্রম হতে পারে না। ঠিক সময়েই সে চিঠিটা পাঠিয়েছে। দেরি করে পাওয়ার জন্য আমাদের কপাল দায়ী। হয়তো হোয়াইট হর্স হুইস্কির বোতল খুলে সে চিঠি লিখতে বসেছিল। তাই নেশার ঝোঁকে হ্যাভনের পরিবর্তে হর্স হয়ে গেছে।

ক্রোমের যুক্তি পোয়ারোর পছন্দ হলো। সে ঘাড় নেড়ে সায় দিলো।

এমন সময় স্টেশনে ট্রেন এসে ঢুকলো তীব্র বাঁশি বাজিয়ে। আমরা যে যার জায়গায় গিয়ে বসলাম। ট্রেন একসময় ধীরে ধীরে চলতে শুরু করলো।

এক সার্জেন্ট কি যেন খোঁজাখুঁজি করছিলো। তারপর ক্রোমের দিকে এগিয়ে এসে হাত-পা নেড়ে কি যেন বললো। খানিকবাদে সার্জেন্ট চলে গেল। আমরা ক্রোমের কাছে গিয়ে জানতে চাইলাম সার্জেন্ট কি বলে গেল। ক্রোম বললো–কার্স্টনের সার্জন শ্রদ্ধেয় স্যার

কার মাইকেল ক্লার্ক খুন হয়েছে। ভারী কোনো অস্ত্র দিয়ে তার মাথাটা একেবারে চুরমার করে দেওয়া হয়েছে।

চক্ষু বিশেষজ্ঞ হিসেবে এই শান্ত সদাশয় নিঃশত্রু মানুষটি একসময় খুব নাম করেছিলো। সম্প্রতি এই কাজ থেকে সে অবসর গ্রহণ করেছে। জীবনের বাকি দিনগুলো নিরিবিলিতে কাটানোর জন্য সে ডিভনের প্রাকৃতিক পরিবেশ পছন্দ করেছিলো। চাকরি করাকালীন সে অনেক অর্থ রোজগার করেছে। বছর তিনেক আগে এক দূর সম্পর্কের কাকার সম্পত্তি সে লাভ করে। সংসারে কেবল স্ত্রী এবং ভাই ফ্রাঙ্কলিনকে নিয়ে বাস করতো। ভাই বিয়ে করেনি। নিজের সন্তানও ছিল না। অথচ বিস্তর টাকা। খরচ তত করতে হবে। হালে তার একটা নেশা হয়েছিল। শহরের পুরানো জিনিস বিক্রির দোকান ঘুরে দেশীয় বস্তু সংগ্রহ করতো। ফলে তার এক বিরাট সংগ্রহশালা গড়ে ওঠে। সেখানে চীনের মাটির বাসনপত্র থেকে চীনের কারুকার্যখচিত পোশাক ও আসবাবপত্র ছিলো।

সব শুনে পোয়ারো মন্তব্য করলো–এবার খুনী শহরের মান্যগণ্য ব্যক্তি। হেস্টিংস, আমরা প্রথম থেকে খুনীকে উন্মাদ বা পাগল ভেবেছি, আসলে সেটা ভুল। একটা পাগল দিনের পর দিন নিপুণভাবে সুপরিকল্পিতভাবে একের পর এক খুন করে যাবে অথচ ঘুণাক্ষরেও সে ভুল করবে না। তার এই অদ্ভুত পরিকল্পনার আড়ালে একটা অদৃশ্য ইতিহাস আছে। সেটা আমাকে আবিষ্কার করতেই হবে।

স্থানীয় থানার পুলিশ অফিসার ওয়েলস স্টেশনেই ছিলো। স্টেশনে থেকে গাড়িতে করে আমরা তার সঙ্গে ঘটনাস্থলের দিকে রওনা হলাম।

পথে যেতে যেতে পুলিশ অফিসার জানালো, রোজ খাওয়া-দাওয়া সেরে নৈশ ভ্রমণে বেরোনো মৃতের অভ্যাস ছিল। অন্যান্য দিনের মতো বেড়াতেও বেরিয়েছিল।

স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের জরুরী নির্দেশ পেয়ে ভদ্রলোককে সাবধান করে দেওয়ার জন্য ওয়েলস তার বাড়িতে ফোন করে। কিন্তু তখনও সে বাড়িতে ফেরেনি। রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা হবে। এত রাত পর্যন্ত সে কখনো বাইরে থাকতো না। ওয়েলসের মনে সন্দেহ জাগে। দেরি না করে লোকজন নিয়ে সে তার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে। সে কোন পথ দিয়ে বেড়াতো সেটা মোটামুটি জানা ছিল। অতএব সেইমতো কিছুটা এগোতেই পথের পাশে ঝোঁপের মধ্যে তার মৃতদেহ নজরে পড়ে। উপুড় হয়ে পড়ে আছে। ভারী কিছু দিয়ে মাথায় আঘাত করা হয়েছিল। তাই মাথাটা থেঁতলে গিয়েছিল। তার পাশে পড়ে আছে এ.বি.সি. গাইড বুক।

নির্দিষ্ট স্থানে এসে আমাদের গাড়ি থামলো। বাড়ির জন্য স্থান নির্বাচনে তার ভুল হয়নি একটুও। নাম-যশ সব পেয়েছিলো সে। পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে বাড়ির নাম রাখা হয়েছে নিরালা। বৃদ্ধ খানসামা ডেভরিন আমাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে ঘরে বসলো। তারপর সে মিঃ ফ্রাঙ্কলিনকে খবর দিতে চলে গেল।

তামাটে গায়ের রঙ, মুখের রেখায় ইস্পাত কাঠিন্য, ঝকঝকে দুটো নীল চোখে বুদ্ধির ছাপ পরিস্ফুট। ঘরে ঢুকে ফ্রাঙ্কলিন ক্লার্ক আমাদের সঙ্গে পরিচয় করলো। তারপর ব্রেকফাস্ট সাড়া হলো।

ইনসপেক্টর ওয়েলসের মুখে দাদার মৃত্যুর বিবরণ শুনলাম। ফ্রাঙ্কলিন বলতে থাকে। আমি তো ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। ভাবতে পারিনি দাদা সেই উন্মাদ, সেই পাগলটার...এ.বি.সি.-র হাতে মারা যাবে। কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। তাকে খুন করে খুনীর কি যে লাভ হলো এবং কেন করলো?

-এই কেন-র জবাব আমাদের সবার আগে খুঁজে বের করতে হবে। এটাই করা উচিত।

–কে শুনছে এই উচিত শব্দটি? খুনের রক্ত মাথায় চেপে গেলে হাতের কাছে যাকে পেয়েছে তাকে খুন করেছে। ঝোঁকের মাথায় খুন করে ফেলেছে এমন ঘটনা আমি অনেক দেখেছি।

ক্রোম বললো, আপনার দাদা কি কোনো বেনামী চিঠি...

-না, সেরকম কিছু শুনিনি।

–গতকাল সে অন্য দিনের মতো সুস্থ ও স্বাভাবিক কি ছিলো?

-তবে দাদার স্বাভাবিকত্ব ছিল কিছুটা অন্যরকম। উত্তেজক প্রকৃতি ছিল তার। তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়তো। কালকেও তার ব্যস্তবাগীশ চেহারার মধ্যে ব্যতিক্রম দেখিনি। তবে বৌদির অসুখের পর থেকেই তার এই সচেতনতা লক্ষ্য করি। আমার বৌদি ক্যান্সারে ভুগছে। সে কোনোদিন ভালো হয়ে উঠবে না। এটা প্রত্যেকেই মানে।

মনে করুন আপনার দাদা, পোয়ারো প্রশ্ন করলো, সমুদ্রের উপকূলে বালির ওপর অথবা নির্জন কোনো ঝোঁপের মধ্যে মৃত অবস্থায় পড়ে আছে, পাশে একটা পিস্তল, তাহলে আপনার কি মনে হতো?

–তাহলে ভাবতাম, দাদা নিজে আত্মঘাতী হয়েছে।

–আচ্ছা, আপনার দাদা রোজই কি রাতের খাওয়া সেরে ভ্রমণে বেরোতেন?

–রোজই যেতো, তবে বৃষ্টি-বাদল হলে অবশ্যই বাদ পড়তো।

–তিনি যে রোজ রাতে ঘুরতে বেরোতেন সেটা কি সকলে জানতো? অর্থাৎ গ্রামের লোকজনও কি জানতো?

–ঠিক বলতে পারবো না। তবে জানাটাই স্বাভাবিক। কারণ এখানে তো লোকজনের সংখ্যা খুব বেশি নয়।

যদি কোনো অচেনা উটকো লোক গ্রামে প্রবেশ করে তাহলে যে কোনো লোকের নজরে নিশ্চয়ই পড়বে।

–জুলাইয়ের আগে হলে হ্যাঁ বলতাম। কিন্তু তারপর থেকে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি এখানে সবসময় ট্যুরিস্টে ভর্তি থাকে। অতএব কারোকে স্বতন্ত্রভাবে আবিষ্কার করা সম্ভব নয়।

-কাল কি আপনার দাদার সঙ্গে কেউ দেখা করতে এসেছিল?

–এটা ডেভরিন বলতে পারবে। ওকে জিজ্ঞেস করি।

ডেভরিন জানালো, চেনা বা অচেনা কোনো লোকই তার সঙ্গে দেখা করতে আসেনি। এমন কি বাড়ির ধারেকাছে সন্দেহজনকভাবে কাউকে ঘুরঘুর করতেও সে দেখেনি।

ডেভরিন চলে গেল। ঘরে এসে ঢুকলো বছর সাতাশের এক যুবতী। মেয়েটিকে সুন্দরী বলা চলে। তার সঙ্গে ফ্রাঙ্কলিন আমাদের পরিচয় করিয়ে দিল–দাদার সেক্রেটারি মিস গ্রে।

একটু দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে সে বললো, যদি আমি আপনাদের কোনো সহযোগিতা করতে পারি...

-আপনি তো স্যার মাইকেলের চিঠিপত্র দেখতেন, তাই না? ক্রোম প্রশ্ন করলো। আপনি কি এমন কোনো চিঠি পেয়েছেন যেটা এ.বি.সি. পাঠিয়েছে?

-না!

আমরা উঠে পড়লাম। ঘটনাস্থলের দিকে আমরা রওনা হলাম। সবার পিছনে মিস গ্রে আর আমি ছিলাম।

আমি গলা ঝেড়ে তাকে উদ্দেশ্য করে বললাম, এমন একটা ঘটনা স্যার কারমাইকেলের মতো লোক...

-সত্যি, এ যেন অবিশ্বাস্য। আমি তো এখনও ভাবতে পারি না। রাতে আমি যখন বিছানায় শুয়ে তখন থানা থেকে খবরটা এলো। বাইরে ব্যস্ততা, শোরগোল শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ি। দেখি, ডেভরিন আর মিঃ ফ্রাঙ্কলিন বেরোবার জন্য তৈরি হচ্ছেন।

–আচ্ছা, উনি নৈশভ্রমণ সেরে কখন ফিরতেন?

দশটা নাগাদ, খুব বেশি হলে সোয়া দশটা, তিনি খিড়কি দরজা দিয়ে ঢুকে সোজা নিজের শোবার ঘরে চলে যেতেন। মাঝে মাঝে না শুয়ে গ্যালারিতে গিয়ে জিনিসপত্র দেখতেন, ঘাঁটাঘাঁটি করতেন। থানা থেকে খবর না দিলে আমরা জানতেই পারতাম না যে এমন একটা অঘটন ঘটে গেছে।

–ওঁর স্ত্রী নিশ্চয়ই খবরটা পেয়ে ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়েছেন?

–না, ডাক্তার তার আগেই ঘুমের ওষুধ খাইয়ে বেহুশ করে দিয়েছে।

মিঃ ফ্রাঙ্কলিন আমাদের সমস্ত জায়গা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাচ্ছিল। জায়গার নামও তার কাছ থেকে আমরা জানতে পারছিলাম। পায়ে পায়ে আমরা এগোচ্ছিলাম। হঠাৎ মিস গ্রে আমার বাঁ হাত চেপে ধরে আমার কাঁধে মাথা দিয়ে চোখ বুজলো। ওর দেহটা এলিয়ে পড়লো। মিঃ ফ্রাঙ্কলিন দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসে ওর কাধ ধরে ঝাঁকুনি দিল।

-থরা, কি হলো? চোখ খোল, এখানে আমাদের আসাই ভুল হয়েছে। থরা, থরা বাড়ি চলো।

মিঃ ফ্রাঙ্কলিন আমাদের দিকে তাকিয়ে বললো, বুঝতেই পারছেন, এমন জায়গায় বেশিক্ষণ...

অতএব কি আর করা। ধীর পায়ে আমরাও ফিরে এলাম মৃতদেহটি নিজের চোখে দেখবো বলে। ততক্ষণে মিস গ্রে কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। ফ্রাঙ্কলিনের হাত ছেড়ে দিয়ে আমাদের সঙ্গে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলো।

ঘরের কাছাকাছি হতে আমরা লক্ষ্য করলাম সৌম্য শান্ত চেহারার এক প্রৌঢ় ডাক্তারি ব্যাগ হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

–ডাক্তার, কেমন দেখলেন? ফ্রাঙ্কলিন তাকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করলো।

–না, বিশেষ কিছু নয়। এটি একটি হত্যাকাণ্ড সহজ ও সাধারণ। শক্ত কোনো অস্ত্র নিয়ে মাথার পেছনে আঘাত করা হয়েছিল। যাই লেডি ক্লার্ককে একবার দেখে যাই। এলাম যখন, ডাক্তারবাবু সেখান থেকে চলে গেল।

আমি ঘরে ঢুকতে গিয়ে বাধা পেলাম। রেলিং-এ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মিস গ্রে-র দিকে দৃষ্টি চলে গেল। আমি তার পাশে গিয়ে বললাম–আপনি কি ভাবছেন?

–ভাবছি সেই পরবর্তী হতভাগ্যের কথা, যার নাম বর্ণমালার চতুর্থ অক্ষর দিয়ে শুরু।

–সত্যি, তা যা বলেছেন। এভাবে কতদিন যে চলবে।

-ঠিক বলেছেন। কখন যে মিঃ ফ্রাঙ্কলিন আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে টের পাইনি। তার গলার আওয়াজ শুনে ফিরে তাকালাম।

-কাল রাত থেকে কেবল ভেবেই চলেছি। ফ্রাঙ্কলিন বলতে থাকে। কিন্তু কোনো কূল কিনারা খুঁজে পাইনি। ঠিক করলাম, এ ব্যাপারে সঁসিয়ে পোয়ারোর সঙ্গে আলোচনায় বসতে হবে। বুঝলেন মিঃ হেস্টিংস, এ রহস্যের সমাধান করা ক্রোমের কর্ম নয়। কার দ্বারা কি হতে পারে আমি তোক দেখলে বুঝতে পারি। অবশ্য ইতিমধ্যে আমি একটা পরিকল্পনা করেছি। পরে পোয়ারোকে জানাবো।

ফ্রাঙ্কলিন আর কথা না বাড়িয়ে লেডি ক্লার্কের ঘরের দিকে চলে গেল।

-বারো ঘণ্টাও হয়নি খুনটা হয়েছে। থরা বললো, এর মধ্যে খুনী কি কর্পূরের মতো উবে গেল? পুলিশও তাকে ধরতে পারলো না, কেন? সেটা ভেবে পাচ্ছি না।

–পুলিশ ঠিক ধরতে পারবে। দুদিন আগে আর পরে...। আমি কথা বলতে বলতে পাশে তাকালাম। দেখি থরা ততক্ষণে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে। মনে হয় হঠাৎ কিছু মনে পড়েছে তার।

আমি তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

.

এটা ক্যাপ্টেন হেস্টিংসের লেখা নয়, অতএব এমন ধারণা পোষণ করবেন না।

ছবিটার নাম শেষ পাখি।

ম্যাটিনি শো শেষ হলো, সবার বেরোবার তাড়া। হুড়োহুড়ি করে লোকেরা দরজার দিকে এগোতে থাকে।

তখন রাস্তার ফেরিওয়ালা নিউজ ডেইলি-র সন্ধ্যা সংস্করণ নিয়ে ছোটাছুটি করছে। কোটের পকেট থেকে খুচরো পয়সা বের করে একটি কাগজ কিনে কাস্ট সমুদ্রের ধারে গিয়ে নিরিবিলি জায়গা বেছে নিয়ে একটি বেঞ্চিতে বসলেন। কাগজের প্রথম পাতাটি মেলে ধরলেন চোখের সামনে

বড় বড় অক্ষরে প্রকাশিত হয়েছে—

স্যার কার মাইকেলক্লার্ক নিহত। কানে শোকের ছায়া, খুনী উন্মাদের নতুন অপকীর্তি।

নীচে দুকলম জুড়ে ঘটনার পূর্ণ বিবরণ ছাপা হয়েছে।

বেক্সহিলে মাত্র একমাস আগে এলিজাবেথ বার্নার্ডের অদ্ভূত হত্যা রহস্যের ঘটনা হয়তো পাঠকদের মনে আছে। তার পাশে খোলা অবস্থায় একটা এ.বি.সি. গাইড পাওয়া গিয়েছিল। আবার মৃত স্যার কারমাইকেলের নিষ্প্রাণ দেহের পাশে ঐরকমই একটা গাইডবুক পাওয়া যায়। প্রশাসনের ধারণা, দুটি ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তিই নায়ক। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ...

-দেখুন দেখি, কি বিশ্রী কাণ্ডই না ঘটে গেল।

চমকে উঠলো কাস্ট। কাগজ ভাঁজ করে পাশে তাকালেন। এক যুবক তার পাশে বসে আছে।

-কাণ্ড...কাণ্ডই বটে, বিশ্রী, ভয়ঙ্কর।

–এই মত পাগলদের, কাস্টের হাত থেকে নিচে পড়ে যাওয়া কাগজটা তুলতে তুলতে যুবকটি বলতে থাকে, ওপর থেকে এদের চেনা ভীষণ অসুবিধা, আমার আপনার মতো সহজ সাধারণ দেখতে...

–তা যা বলেছেন।

–কিন্তু তফাত আছে। নেশার ঝোঁকে যেন যুবকটি কথা বলছে, হয়তো সে ভীষণভাবে কারো কাছ থেকে আঘাত পেয়েছে, হয়তো তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে যুদ্ধে পাঠানো হয়েছে, হয়তো বা...।

কাস্ট মাথা নেড়ে সায় দিলেন, আপনার কথা মিথ্যে নয়।

–আমি কিন্তু যুদ্ধ-টুদ্ধ পছন্দ করি না মোটেও।

–আমিও আপনার মতো। যুদ্ধ, প্লেগ, ক্যান্সার এদের ধারে কাছে যেতে নারাজ। এবার হো হো করে কাস্ট হেসে উঠলেন।

সামান্য কথাতে এত হাসির অর্থ কি, সেটা যুবকটি বুঝতে চেষ্টা করলো।

হাসতে হাসতে কাস্টের যেন খেয়াল হল, এবার হাসি থামিয়ে বললেন–মানে...বুঝলেন কিনা...যুদ্ধে গিয়ে মাথাটা কেমন যেন বিগড়ে গেছে। মাঝে মাঝে কি যে হয়। চিন চিন করে থেকে থেকে মাথার যন্ত্রণা হয়। এমন অবস্থা হয় তখন কি যে করবো ভেবে পাই না..বুঝতে পারি না... কেমন যেন ঝোঁকের মাথায়..মানে, শরীর স্বাস্থ্য আমার তেমন সুবিধের নয়।

যুবকটি উঠে দাঁড়ালো, হাতের সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললো–এখন চলি, এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে হবে। পরে আবার আমাদের দেখা হবে।

কাস্ট নির্বিকার নিস্পৃহ চিত্তে একইভাবে বেঞ্চির ওপর বসে রইলেন।

সামনের চওড়া রাস্তা দিয়ে কত মানুষের যাতায়াত। মানুষ...কথা...পায়ের আওয়াজ...কথা...।

–বেক্সহিলের পর খুনীর কার্স্টনে পায়ের ধুলো পড়েছে।

–আমি তো শুনলাম, সমুদ্রের ধারে বালির ওপর মুখ থুবড়ে...

–বলো কি! আমি আর তুমি, সবে আমরা গতকাল বাঁকের মুখে দোকানটায় বসে চা খেলাম...

–খুনী ধরা পড়বেই..হ্যাঁ, আলবাত ধরা পড়বে..ইয়ার্ডের লোকজন...

–বাছাধন, কুকর্ম করে কতদিন আর লুকিয়ে দিন কাটাবে। একদিন না একদিন...

–হয়তো লোকটা এই শহরেই ঘুর ঘুর করছে...হয়তো আমাদের কাছাকাছি কোথাও আছে...আমাদের সঙ্গে ভিড়ের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে ফেলেছে...

কাস্ট ধীরে ধীরে বেঞ্চি থেকে উঠে পড়লেন। তিনি নিজের মনে রাস্তা বরাবর হেঁটে এলেন চৌমাথায়। চায়ের দোকানে ঢুকে এক কোণে বসলেন, হাতে চায়ের কাপ।

..কি করে যে অতসব অদ্ভুত খবর মানুষ পাচ্ছে ভেবে পাই না। তবে হ্যাঁ, এই অজস্র প্রহসনের মধ্যে আশার যেটুকু হলো-বেটি বার্নার্ড এবং কারমাইকেল ক্লার্কের নামের সঙ্গে এ্যান্ডোভারের সেই অখ্যাত অনামী সত্তর বছরের বুড়ি এলিন এ্যাম্বারের নামটাও এতদিন পর যুক্ত হলো, আমরা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

স্যার ক্লার্কের মৃত্যুর চারদিন পর পার্লামেন্টের এক বিশেষ অধিবেশনের তর্ক-বিতর্ক ডেইলি ফ্লিকার-এর পৃষ্ঠায় বড় বড় হরফে ছাপা হলো সংবাদ শিরোনামে

রহস্য সমাধানের মঞ্চে অবশেষে এরকুল পোয়ারোর পদার্পণ। প্রথম দিনের তদন্তের ফলে রহস্য আশু মীমাংসার পথে।

পৃষ্ঠার এককোণে আরেকটি সংবাদ শিরোনাম নজরে পড়লো।

আমাদের বিশেষ প্রতিনিধির সহিত পোয়ারোর বিশিষ্ট সুহৃৎ ক্যাপ্টেন হেস্টিংসের নিভৃত সাক্ষাৎকারের পূর্ণ বিবৃতি

আমি পোয়ারোকে বললাম, খবরের কাগজের প্রতিনিধি দূরে থাক, এক্স, ওয়াই কারো সঙ্গেই আমার এ ব্যাপারে কোনো কথা হয়নি।

–জানি। তিলকে তাল করা ওদের স্বভাব, পোয়ারো বললো।

–কিন্তু, কিন্তু...।

–আর কিন্তু কিন্তু কোরো না, ওসব ভুলে যাও। দিনের পর দিন যদি খবর ওভাবে ছাপা হয় তাহলে আমাদের লাভ হবে। ক্ষতি হবে না।

–একথা বলছো কেন?

কারণ কাগজওয়ালারা জানে, যে এই কেসের তদন্তের ভার আমার ওপর দেওয়া হয়েছে।

স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে আগত লোকেদের সঙ্গে ক্রোম কথা বলে জেনেছে তা দিয়ে কেবল কাগজের পর কাগজ লেখা হলো ঠিকই, কিন্তু কোনো কাজে লাগলো না।

পোয়ারো কিন্তু আর মুখ খুললো না। কিছু জানতে চাইলে কেবল এই বলে, এ বয়সে ছুটোছুটি আর সহ্য হয় না। পুলিশ যা করার তা তো করছে। অবশ্য তুমি ভাবছো আমি চুপ করে কেবল ঘরে বসে আছি। তবে বন্ধু, তুমি কি জানো না যে আমার পা কাজ করে না, মাথা কাজ করে। আমার মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষগুলি এখন সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

তবে আমি খুনীর ইতিহাস নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না। খুনীর মনের গোপন কথাটুকু উদ্ধারের চেষ্টা করছি মাত্র।

–মানে উন্মাদের মনস্তত্ত্ব?

–কথাটা শুনতে সহজ ও ছোটো। কিন্তু কাজটা কঠিন। খুনীর আসল রূপ কি? বাইরে থেকে আমরা তাকে যেমন ভাবছি, সেরকম না অন্য কিছু? তবে হয়তো ধীরে ধীরে তার স্বরূপ আমাদের কাছে ধরা পড়েছে। এ্যান্ডোভারের খুনের পর যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছিল বেটি বার্নার্ড পরে সে জায়গা পূরণ করে দিলো অনেকটা। আর স্যার কারমাইকেলের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সেই খালি জায়গা আরো বেশ কিছুটা পূরণ হলো। তার মুখোশ আমার সামনে একটু একটু করে খুলে যাচ্ছে। আসলে মুখ ঢাকতে সে মুখোশ ব্যবহার না করে করছে মন, পরবর্তী খুন না হওয়া পর্যন্ত

–পোয়ারো, তুমি কি বলছো!

-কেন? অন্যায় কিছু বলেছি? তা তো নয়। খুন আর একটা হবেই। আমরা কোনোভাবেই সে খুন আটকাতে পারবো না। অবশ্য এই চতুর্থ খুনটি আমাদের রহস্যে যথেষ্ঠ আলোকপাত করবে। একটা না একটা সূত্র রেখে যাবে। ঐ সূত্র ধরেই আমরা তাকে একদিন না একদিন ধরবো।

-কে সেই পাগল?

–উত্তর জানা নেই। তার নাম বা ঠিকানা জানার কোনো উৎসাহ আমার নেই। কেবল আমি তার মনের খোঁজ পাওয়ার জন্য উতলা হয়ে আছি। আমি ফাঁদ পেতেই রেখেছি। কেবল সেটা পড়ার অপেক্ষায়। তারপরেই সুতো ধরে টান।

তার মানে তোমার সুতোয় টান পড়তে না পড়তে আরো কয়েকজন নিরীহ মানুষের মৃত্যু হবে, তাই না?

-এর মধ্যে মাত্র তিনজন তো মারা গেল। অথচ...আচ্ছা, তাড়াতাড়ি উত্তর দাও তো, গাড়ি চাপা পড়ে সপ্তাহে যদি একশো চল্লিশ জন নিহত হয় তাহলে দুমাসে কত সংখ্যায় দাঁড়াবে?

–পোয়ারো, এটা সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার।

–আমি জানি, বন্ধু। কিন্তু ভাবলে দেখবে, দুটোর মধ্যে কেনো ফারাক নেই। কারণ দুটোই মৃত্যু। গাড়ি চাপা পড়লে যা পরিণতি হয়, অজ্ঞাত কোনো আতাতায়ীর হাতে খুন হলেও একই ফল হয়। হেস্টিংস, তুমি খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করো, তিন তিনটে খুন, অথচ ধরা পড়লো না। অর্থাৎ যারা যথার্থভাবে নির্দোষ, খুনী তাদের কোনোভাবেই আততায়ী বলে প্রতিপন্ন করতে দিলো না।

-তাতে লাভ কি?

–লাভ আছে বৈকি। সন্দেহের আগুনে সর্বক্ষণ জ্বলে মরা। এর চেয়ে কঠিন শাস্তি আর কিছু আছে! তিনটে খুনের অপরাধী একজনই, অথচ কাউকে সন্দেহ করার মতো সুযোগ আমরা এক বিন্দু পেলাম না। যাক, এবার কাজের কথা শোন।

কি কাজ?

কাজটা মোটামুটি সহজ। কথার জাল বুনে নিহতদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব পরিচিত যে যেখানে আছে পেট থেকে সমস্ত অজানা গোেপন খবর টেনে বের করে আনন।

তার মানে, তোমার ধারণা, সকলে ইচ্ছে করে কিছু না কিছু তথ্য গোপন রেখেছে?

–মানুষ সব কথা সবসময় গুছিয়ে বলতে পারে না। সেটা ইচ্ছা-অনিচ্ছা নয়। আমি তাদের কাছ থেকে এমন খবর শুনতে চাই যেগুলো ঐসব মানুষের কাছে ফালতু, অকেজো, অযৌক্তিক। হয়তো ঐ কাজগুলোই আমার রহস্য সমাধান করতে সাহায্য করবে।

এরপর পোয়ারো একটা ভাঁজ করা কাগজ পকেট থেকে বের করলো। আমাকে পড়তে দিলো। ওটা একটা চিঠি। হাতের লেখা বোঝা দুঃসাধ্য, মনে হয় কোনো নিচু ক্লাসের কারো লেখা। অজস্র বানান ভুল, সামনে এগিয়ে লিখেছে, বানান সংশোধন করার পর চিঠির বয়ানটা এইরকম দাঁড়ালো–

পরম পূজনীয়েষু,

প্রথমে আমার প্রণাম জানাই। আগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, আপনাকে চিঠি লেখার ধৃষ্টতার জন্য, মাফ করবেন।

মাসির খুন হওয়ার পর আরো একটা খুন হলো। কাগজে ঐ মেয়েটির ছবি আমি দেখেছি। মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেলো...বেচারা। ভাগ্যের কি নিষ্ঠুর পরিহাস। এত কম বয়েসে তাকে এইভাবে মরতে হলো।

মনের কষ্ট দূর করার জন্য কোনোরকমে মেয়েটির দিদির (লন্ডনে যে চাকরী করে) ঠিকানা যোগাড় করলাম, তাকে সমবেদনা জানিয়ে মস্ত বড় একটা চিঠি লিখলাম। সব কিছু চিঠিতে জানালাম, মাসির খুন থেকে শুরু করে আপনার সঙ্গে আলাপ পর্যন্ত। এটাও জানালাম, আমি তার সঙ্গে বিশেষভাবে দেখা করতে আগ্রহী। অবশ্য এ দেখা সে দেখা নয়। একদিন দুদিনের নয়। স্থায়ীভাবে তার সঙ্গে দেখা করতে চাই। দুজনে পাশাপাশি থাকবো। দুজনে মিলে কোমর বেঁধে খুনির হদিস বের করার কাজে লেগে পড়বো। আমরা দুজনে একই ব্যথায় কাতর। অতএব দুজনের বুদ্ধি একত্রে হলে একটা কিছু হবেই। মোদ্দা কথা, তাকে আমি বুঝিয়ে দিলাম যে ওভারটনের পাততাড়ি গুটিয়ে আমি লন্ডনে স্থায়ীভাবে থাকতে চাই।

...একদিন আমার চিঠির জবাব পেলাম। খুশিতে আমি উথলে উঠলাম। কি সুন্দর হাতের লেখা। সে লিখলো, আমার সঙ্গে যোগাযোগ করার কথা সে ভেবেছিলো। কিন্তু ঠিকানা যোগাড় করা সম্ভব হয়নি। তবে আমার মতে তার মত আছে। তাছাড়া, সে...মিঃ পোয়ারো, শুনলে আপনি তাজ্জব বনে যাবেন, আমার জন্য তদবির করে একটা চাকরিও যোগাড় করে ফেলেছে।

..অতএব আপনার বুঝতে বাকি রইল না, আমি এখন লন্ডনে রওনা হচ্ছি। এই চিঠি স্টেশনে বসে লিখছি। আমার নতুন ঠিকানা এখানে দিলাম। যদি সময় সুযোগমতো একবার এখানে আসেন তাহলে খুব খুশি হবো।

প্রণাম জানবেন,

মেরি ড্রেয়ার।

৩. চিঠি পড়া শেষ

চিঠি পড়া শেষ করলাম।

–হেস্টিংস, পোয়ারো বললো, তোমার অনুমান ঠিক। ড্রেয়ার ভীষণ বুদ্ধিমতী মেয়ে।

তারপর পকেট থেকে আর একটা চিঠি বের করলো। তাতে লেখা ছিল–ফ্রাঙ্কলিন ক্লার্ক। জানিয়েছে বিশেষ কাজে সে কদিন লন্ডনে আছে। আগামীকাল পোয়ারোর সঙ্গে দেখা করতে সে আসছে, জরুরী আলোচনা আছে। পোয়ারো যেন ঐ দিন বাড়িতেই থাকেন।

পোয়ারো বললো–ধৈর্য ধরে সব দেখে যাও। দেখবে, অদ্ভুত একটা কিছু ঘটবেই।

.

পরদিন বিকেলে ফ্রাঙ্কলিন এসে হাজির হলো। কোনো ভণিতা না করে সরাসরি কাজের কথা শুরু করলো।

-স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের নাম করা ইনসপেক্টর কোনো কিছু করতে পারলো না। ফ্রাঙ্কলিন বলতে থাকে। আঃ, ক্রোম যত না কাজ করে তার থেকে বড় বড় বুলি আওড়ান। কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা। সময় থাকতে পরের খুনটা অন্তত

-তার মানে, আপনিও নিশ্চিত করে জানেন, আর একটা খুন হবে।

-না হয়ে তো উপায় নেই। তাই আমার পরিকল্পনা, নিহত তিনজনের বন্ধু-বান্ধব আত্মীয় স্বজন একসঙ্গে হয়ে একটা জোরদার সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। সেটি পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন আপনি, এর ফলে হয়তো নতুন কোনো তথ্য পাওয়া যাবে। যেটা খুনীকে ধরতে সাহায্য করবে। আর চতুর্থ চিঠিটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা লোজন নিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় হাজির হবো, কড়া প্রহরার ব্যবস্থা রাখবো। ঐ স্থানের ধারে-কাছে সন্দেহজনক কাউকে দেখলে আপনাকে খবর দেবো। দেখা যাবে হয়তো খুনীকে আমরা কোথাও দেখেছি–এ্যান্ডোভারে, বেক্সহিলে বা কার্স্টনে। খুনের আগে বা পরে কারো না কারো নজরে ঐ মূর্তিমান পড়েছে। আমরা তার আসল পরিচয়ও জানতে পারবো। আপাতত এই সংগঠনে থাকবে তিনজন-মিস মেগান বার্নার্ড, মিঃ ডোনাল্ড ফ্রেসার এবং মিস ড্রেয়ার। আর আমি তো আছিই। এদের সঙ্গে আমি ইতিমধ্যে চিঠির মাধ্যমে যোগাযোগ করেছি। আর...আর..., মিস গ্রে থাকছেন।

বাঃ, মিস গ্রেও থাকছেন।

পোয়ারোর কথাটা শুনে ফ্রাঙ্কলিন খুব লজ্জা বোধ করলো। নিচু স্বরে বললো, মানে বুঝতেই পারছেন, উনি আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকলে আমি চিন্তামুক্ত থাকি। গত দুবছর ধরে তিনি দাদার সেক্রেটারি হিসাবে কাজ করেছেন। গ্রামের লোকেরা আমার চেয়ে তাকে বেশি চেনে। অমি তো কয়েক বছর দেশ-বিদেশে ঘুরে কাটালাম।

-তাই নাকি? দেশ-বিদেশ গেছেন! চীনে গিয়েছিলেন আপনি?

–হ্যাঁ, চীনে তিন বছরের কাছাকাছি কাটিয়েছি।

আরো কিছু কর্থাবার্তার পর ফ্রাঙ্কলিন চলে গেল।

প্রথমে বৈঠক বসলো সোমবার।

গোল টেবিলের বিশেষ লোকটি হলো পোয়ারো। সকলে তার চার পাশে বসেছে। একটু দূরে সকালের কাগজ হাতে নিয়ে আমি বসে আছি। কিন্তু কান আমার সজাগ।

–এটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বৈঠক। পোয়ারো বললো, এর সঙ্গে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড বা পুলিশের কোনো ভূমিকা নেই। ইতিমধ্যে যারা খুন হয়েছে তারা কেউই একে অন্যের আত্মীয় বা বন্ধু নয়। এমন কি তারা সমগোত্রীয় নয়। তবে দুটি ঘটনার তিনটি খুনের মধ্যে আমি একটা যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছি। তা হলো তিনটি হত্যাকাণ্ডের অপরাধী একজন লোক এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে সে নিজে উপস্থিত থেকেছে। তাহলে দ্বিতীয় সূত্র লক্ষ্য করলে বলা যায়, ঐ ব্যক্তিটিকে কেউ না কেউ দেখে থাকবে। হয়তো আপনাদের মধ্যে এমন কেউ আছেন যারা তাকে দেখেছেন, বা তার চালচলনে কোনো বৈশিষ্ট্য আপনাদের মনে রেখাপাত করেছে। তবে খুনী পরিকল্পনামাফিক সুস্থ মস্তিষ্কে একের পর এক খুন করেছে। নিহত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে খবরাখবর তাকে আগে সংগ্রহ করতে হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য সে নিশ্চিয়ই পরে পরে ঐসব ঘটনাস্থলে এসে থাকবে। তাহলে সে কি একবারের জন্যেও খুনীর আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে না? নিশ্চয় করেছে। আপনাদের স্মৃতির মণিকোঠায় তার কোনো আবছা ছাপ রয়ে গেছে। আজ আমরা অতীতের দিনগুলো স্মরণ করবে, তাকে চেনার চেষ্টা করবো এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই চেষ্টা বিফল হবে না।

কিন্তু, ফ্রাঙ্কলিন বললো, আলোচনার একটা কেন্দ্রবিন্দু তো থাকা প্রয়োজন। এখানে সেটা কি হবে?

-এখানে গদ বাঁধা কোনো প্রশ্ন করা হবে না। বরং এমন অনেক প্রশ্ন করা হবে যেগুলো অযৌক্তিক, অকেজো, যেমন আপনাকে দিয়েই শুরু করা যাক। আপনার দাদা যেদিন খুন হলেন সেদিন রাতে ঘুমোত যাওয়ার আগে আপনি কি কি করেছিলেন?

–বিশেষ কিছু নয়। অন্য দিন যা করি, সেদিনও তাই করেছিলাম। সকালে ঘুম থেকে উঠে ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়ে পড়েছিলাম নৌকো নিয়ে। দুপুরে বাড়ি ফিরি। স্নান খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘন্টাখানেক বিশ্রাম নিই। তারপর কিছু ব্যক্তিগত চিঠি নিয়ে বসি। বিকেলে শেষ ডাক না পাওয়ার দরুণ কেইন্টন পর্যন্ত দৌড়নো। সেখানকার বড় পোস্টাফিসে চিঠির বোঝা খালাস করে বাড়ি ফিরে আসি। তারপর রাতের খাবার খাওয়া, শেষে ঘুম। ঘুমিয়ে পড়তাম সেদিনও। কিন্তু থানা থেকে ফোন এসে

–ঠিক আছে, এই পর্যন্ত। আচ্ছা, আপনি নৌকা বাইতে যাওয়ার সময় এমন কাউকে দেখেছেন, যার কথা আজও আপনার বিশেষভাবে মনে পড়ে।

–এক মোটাসোটা মহিলাকে দেখেছিলাম।

–আর যখন বিকেলে চিঠি পোস্ট করতে গেলেন?

-তখন...তখন হা মনে পড়েছে একটা মেয়ে। মেয়েটা আর একটু হলে আমাকে সাইকেলের ধাক্কা লাগিয়ে দিতো। আমি আনমনা ছিলাম না, তাই রক্ষে।

-এবার মাদমোয়াজেল গ্রে, আপনি সেদিন কি কি করেছিলেন?

–নিত্যদিনের মতো ব্রেকফাস্ট সেরে স্যার কারমাইকেলের চিঠির বোঝা নিয়ে বসেছি। কাজ যখন শেষ করে উঠলাম তখন বেলা বারোটা। তারপর স্নান সেরে খাওয়ার পর্ব চুকিয়ে বসলাম চিঠি লিখতে। দুই বান্ধবীকে চিঠি লেখা শেষ করে কিছু সেলাই ফোঁড়াই করেছিলাম। দেখতে দেখতে কেটে গেল সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ রাতের খাবার খেয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম।

-বোনের সঙ্গে শেষ কবে আপনার দেখা হয়েছিল?

ঘটনার পনেরো দিন আগে।

–কি কথা হয়েছিল?

-মামুলি কয়েকটি কথা! টাকাপয়সার টানাটানি যাচ্ছে। মিলি হিগলিকে সে মোটেও পছন্দ করে না। মিস মেরিয়ান মাইনে বাড়াতে মোটেও রাজী নন, এই ধরনের আর কি।

এবার পোয়ারো ফ্রেসারের দিকে তাকিয়ে বললো–আপনি তো কাফের আশেপাশেই ঘোরাঘুরি করছিলেন যেদিন মিস বার্নার্ড খুন হয়, তাই না?

-হ্যাঁ।

–বিশেষ কাউকে দেখেছিলেন?

–না।

–আচ্ছা মেরি, তোমার স্বামী তো তোমাকে প্রায় রোজই চিঠি লিখতেন?

–হ্যাঁ।

–শেষ চিঠি কবে দিয়েছিলেন?

–ঘটনার তিনদিন আগে লিখেছিলেন?

–কি হলো, চুপ করলে কেন? কি লিখেছিলেন?

-উনি বলেছিলেন, আমি যেন বুধবার আমার নিয়োগকর্তার কাছ থেকে ছুটি করিয়ে রাখি। কারণ ঐ দিন ছিল আমার জন্মদিন। সকাল সাতটার মধ্যে আমাকে এ্যান্ডোভারে চলে যেতে বলেছিলেন, উনিও সেদিন দোকান বন্ধ রাখবেন। আমরা সারাদিন হৈ হৈ করে বেড়াবো, সিনেমা দেখবো, হোটেলে খাবো। তিনি আমাকে একটা জামা কিনে...সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

ফ্রাঙ্কলিন মিসেস এ্যাস্বারের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে বললো, একদিনের একটা ঘটনার কথা শুনুন। আমি ফুটপাথ ধরে আপনমনে হাঁটছি। এমন সময় শোরগোল কানে এলো। দেখি একটা মেয়ে গাড়ি চাপা পড়েছে। তার মাথার ওপর দিয়ে গাড়ির পেছনের চাকাটা সম্পূর্ণভাবে চলে গেছে। সে তার মায়ের সঙ্গে বেরিয়েছিল। সেদিন তার জন্মদিন ছিল। নতুন একজোড়া জুতো তার মা তাকে কিনে দিয়েছিলো। সেই জুতো জোড়া হাতে নিয়ে

মা কান্নায় ভেঙে পড়লো। এই জুতো জোড়া পরেই তার মেয়েটির মৃত্যু হলো বলে তার মায়ের ধারণা।

এইসময় মেগান বলে উঠলো, আমাদের বাড়িতেও এরকম একটা ঘটনা ঘটে গেছে। বেটি যেদিন মারা যায় তার আগের দিন মা তার জন্যে এক জোড়া জুতো কিনে এনেছিল। বেটির আর সেটা পরা হয়নি। ঐ জুতো জোড়া নিয়ে মা কেবল কাঁদে।

নীরবতায় ঘর ভরে গেল। খানিক বাদে স্তব্ধতা ভঙ্গ করে থরা। বলল, এখন আমরা কি করবো?

–আপাতত কিছু না, ফ্রাঙ্কলিন বললো এখন আমাদের পাঁচজনকে সবসময় সজাগ হয়ে থাকতে হবে। নিয়মিত মঁসিয়ে পোয়ারোর সঙ্গে যোগাযোগ রাখবো। আর চার নম্বর খুনের ঘন্টা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে যাবো। মঁসিয়ে পোয়ারো, তাই তো?

-হ্যাঁ, তাই। তবে এ ব্যাপারে আমার দু-একটা কথা আছে। প্রথমে কাফের মিলি হিগলিকে কিছু প্রশ্ন করা প্রয়োজন। কথার মারপ্যাঁচ দিয়ে তার পেট থেকে গোপন তথ্য টেনে বের করতে হবে। এই কাজের দায়িত্ব আমি মাদমোয়াজেল বার্নার্ড ও মঁসিয়ে ফ্রেসারের ওপর দিতে চাই। এক্ষেত্রে মিস মেগান, আপনার কাজ হবে, মেয়েটির সঙ্গে যে-কোনো ভাবে ঝগড়া সৃষ্টি করা। আপনি বলবেন, সে আপনার বোনকে দুচোখে দেখতে পারতো না, সেটা সে জানিয়েছে। এ প্রসেঙ্গ বেটি অনেক কথা আপনাকে

জানিয়েছে, বলবেন। আর মঁসিয়ে ফ্রেসার, আপনি মেয়েটির সঙ্গে মিথ্যে প্রেম শুরু করুন।

–আমি যদি একবার মেয়েটির খুব কাছে যাওয়ার চেষ্টা করি

ফ্রাঙ্কলিনকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে থরা চড়া গলায় বলে উঠলো-ওসব নিয়ে তোমায় মাথা ঘামাতে হবে না। তোমার জন্য অন্য কাজ আছে।

–নিশ্চয়ই, পোয়ারো মাথা নেড়ে বললো, তাছাড়া আপনার খুব কাছে যখন ও আছে। পোয়ারো থরাকে ইঙ্গিত করলো।

ধরা দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বললো, না। আপনি হয়তো জানেন না, আমি ও বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছি। ও বাড়িতে থাকা আমার সম্ভব নয়। কয়েকদিনের মধ্যে পাকাপাকিভাবে লন্ডনে চলে যাব।

–লেডি ক্লার্ক বর্তমানে কেমন আছেন?

–একেবারেই ভালো নয়। থরার পরিবর্তে ফ্রাঙ্কলিন জবাব দিলো। কালকেও তিনি আমাকে বলেছিলেন, যেন আপনাকে আমি অনুরোধ করে বলি ওঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে। যদি দয়া করে–

–অবশ্যই। ওঁকে বলবেন, কাল অথবা পরশু নাগাদ আমি ওঁর কাছে যাবো।

–আমি কি করবো, সেটা তো বললেন না। মেরি বলে উঠলো।

-আছে। তোমার একটা সুন্দর কাজ আছে। তুমি এ্যান্ডোভারে যাবে। সেখানকার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তোনো। তাদের মনের সঙ্গে একেবারে মিশে যাবে। তারা দিন-রাত রাস্তায় খেলা করে। অতএব তাদের চোখে কিছু পড়া অস্বাভাবিক নয়।

ফ্রাঙ্কলিন কিছু বলার আগে সে নিজেই বলে উঠলো–খবরের কাগজে বরং একটা বিজ্ঞাপন দিই। ঠিক এইরকম গোছের–এ. বি. সি. হুঁশিয়ার। তোমার পরিচয় আমার আর অজানা নেই। নগদ একশো পাউন্ডের বিনিময়ে আমি মুখ বন্ধ রাখতে রাজি। ইতি–ডিই. এফ.। কি, ভালো হবে না?

–ভালো হবে। একবার চেষ্টা করে দেখতে তো দোষ নেই।

ফ্রাঙ্কলিন বললো–সকলের সুবিধার জন্য সিদ্ধান্তগুলো নেওয়া হলো। আমি পড়ছি, আপনারা শুনুন।(১) মিলি হিগলির সঙ্গে মিস বার্নার্ডের কথোপকথন। (২) মিঃ ফ্রেসারের সঙ্গে মিলি হিগলির প্রেম প্রেম খেলা।(৩) এ্যান্ডোভারের ছোটো ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিস মেরি ড্রেয়ারের বন্ধুত্ব করা (৪) বিজ্ঞাপন।

এরপর সবাই যে যার বিদায় নিলো।

আমি পোয়ারোকে প্রশ্ন করলাম, এসব আলোচনা থেকে তুমি কি বুঝলে?

-বুঝলাম, হাজার কষ্ট-দুঃখের মধ্যেও এক বিন্দুসুখ থাকে। হেস্টিংস তোমার সামনে কেমন সুন্দর একটা নাটক হয়ে গেল, তুমি সেটা লক্ষ্য করলে না। যখন ফ্রাঙ্কলিন মিলি

হিগলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার অভিনয় করার কথা জানালো তখন মিস গ্রে কেমন ক্ষেপে গিয়ে প্রতিবাদ করে উঠলো।

এইসময় আবার মিস গ্রে ঘরে এসে ঢুকলোকয়েকটা দরকারি কথা ছিল, সেগুলো না বলে ফিরতে পারছিলাম না। তাই আবার চলে এলাম, আপনাকে কিছুক্ষণ আগে জানিয়েছি এখানকার চাকরি ছেড়ে দিয়ে লন্ডনে চলে যাচ্ছি। সেটা কিন্তু স্বেচ্ছায় নয়। স্যার কারমাইকেলের মৃত্যুর। পর লেডি ক্লার্ক এমন ব্যবহার শুরু করেছেন যে সেখানে আমার টিকে থাকা সম্ভব নয়। তিনি আমাকে পছন্দ করেন না, সন্দেহ করেন। কথা শেষ করে সে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

জানো হেস্টিংস, পোয়ারো বলতে থাকে, মিস গ্রে যেমন বুদ্ধিমতী তেমন সাহসী। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সচেতন। আচ্ছা, তুমি কি বলতে পারবে, ওর পরনে কি ধরনের পোশাক ছিল?

এমন এলোমেলো প্রশ্ন করছো কেন? তোমার ব্যাপার কি পোয়ারো?

ব্যাপার গুরুতর ভায়া। বৈঠকের আলোচনা চলাকালীন এক ফাঁকে একটা অদ্ভুত কথাটা শুনলাম। এই কাজটা আগে বোধহয় শুনেছি বা নোট বইতে লিখে রেখেছি। কিন্তু কি যে সেই কথাটা

-তুমি কি কথাটা কার্স্টনে শুনেছো

-না, কার্স্টনে নয়। বেক্সহিলে বা এ্যান্ডেভারে হতে পারে। কি জানি। যাই হোক, মিস গ্রে-র আসল গুণটা কিন্তু তার সব গুণকে ছাপিয়ে গেছে। চেহারার লাবণ্য দেখেছো...যেন স্বর্গের দেবী...অথবা....

আমরা নিরালায় পৌঁছালাম। সেখানে গিয়ে মনটা উদাস হয়ে গেল। ডেভরিন ঘরের সামনে দাঁড়াতে এক সুস্থ মোটাসোটা চেহারার নার্স উঁকি মারলো। সে তার পরিচয় দিলো। নাম জানালো ক্যাপস্টিক। লেডি ক্লার্ককে দেখোশোনা করার ভার তার ওপর দেওয়া আছে। সে বললো–আমি জানি আপনারা আসবেন। মিঃ ফ্রাঙ্কলিন আগেই বলে রেখেছিলেন।

-উনি এখন কেমন আছেন?

–কিছুটা ভালো। মনে হয় ডাঃ মেগানের ওষুধ কিছুটা কাজ করেছে।

–উনি কি খবরটা শুনে ভীষণ ভেঙে পড়েছেন?

-না, উনি ভেঙে পড়েননি। কাতর হওয়া বা মুষড়ে পরার জন্য যে বোধ দরকার সেটা ওঁর মধ্যে নেই। অতএব তিনি মনের দিক থেকে স্বাভাবিক আছেন। এত ওষুধে যে-কোনো সুস্থ স্বাভাবিক লোকও বোধশক্তি হারিয়ে ফেলে। তবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা ছিল নিখাদ। স্ত্রীকে সুস্থ করে তোলার জন্য তিনি সবরকম চেষ্টা করেছেন। এখানে কাজ করতে এসে প্রথম প্রথম আমি রীতিমতো ঘাবড়ে যেতাম তার ব্যবহার দেখে, তবে বছরের পর বছর থাকতে থাকতে সব চোখে সয়ে গেছে। তাছাড়া স্যার কারমাইকেল একঘেয়ে জীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এক বিরাট সংগ্রহশালা তৈরি করেছিলেন।

দিনের অনেকটা সময় তিনি সেখানে কাটাতেন। কেনাকাটার জন্য মাঝে মাঝে এদিক-ওদিক যেতেন। মিস গ্রে-কেজিনিসপত্র আনার জন্য ফর্দ করতে সাহায্য করতেন, এইসব।

–মিস গ্রে এখান থেকে চলে গেল কেন, বলতে পারেন?

-শুরুতে লেডি ক্লার্ক তাকে বেশ ভালো চোখেই দেখতেন। অবশ্য পরে...আমরা অনেকক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলছি। চলুন, ভেতরে চলুন। উনি হয়তো ভাবছেন।

আমরা ঘরে প্রবেশ করলাম। চেয়ারে এক রোগা, বিদীর্ণা, রোগে জর্জরিত মহিলার প্রতিমূর্তি যেন বসে আছে। ক্যাপস্টিক আমাদের সঙ্গে লেটি ক্লার্কের পরিচয় করিয়ে দিলো।

–আসুন, মঁসিয়ে পোয়ারো। শুকনো মুখে ভদ্রমহিলা আমাদের অভ্যর্থনা জানালো। তারপর বলতে শুরু করলো, এমন ঘটনা ঘটলো যা আমার চিন্তার বাইরে। আমি বহুদিন ধরে রোগশয্যায় পড়ে আছি। সেই হিসেবে আমারই আগে মরে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু...ঈশ্বরের কি নিষ্ঠুর পরিহাস...। আপনাদের সঙ্গে কথা বলে খুব ভালো লাগছে। আমার শরীরের তো এই হাল। অথচ ঈশ্বর তাকে নিয়ে চলে গেল, রেখে গেল এত বড় বাড়ি, অমন এক অবুঝ ভাই...আমার পক্ষে কি সব কিছু সামলানো সম্ভব। জানেন, ওর স্বভাবটা একেবারে ছোট্ট ছেলের মতো। বয়েসের সাথে স্বভাবের কোনো পরিবর্তন হয়নি। ওকে যে একটু নজরে রাখবো সে ক্ষমতাটুকুও আমার নেই।

–আপনি ওকে নিয়ে ভাবছেন ঠিকই, কিন্তু আমার নজরে তেমন কিছু পড়লো না। একটু আবেগপ্রবণ এই যা।

-হ্যাঁ, ঐ আবেগটাই যত নষ্টের গোড়া। যাই হোক, কাজের কথায় আসি। আমার স্বামীর মত একজন ভালোমানুষকে কিনা শেষপর্যন্ত একটা বদ্ধ উন্মাদের হাতে মরতে হলো। মাইকেলের জন্য আমি যত না কাতর তার চেয়ে দুঃখ পেয়েছি ঐ পাগলার কথা ভেবে। পাগল কি সাধে হয়েছে। অনেক শোক-তাপের ফল, নিজে দুঃখ হলে একজন লোকের দুঃখ অনুভব করতে পারা যায়। যদি একবার তাকে দেখতে পেতাম...আচ্ছা, আপনাদের নাকি ধারণা, লোকটা ট্যুরিস্টদের ভিড়ে মিশে আছে। কিন্তু আমাদের বাড়ির এ পাশটায় তো খুব বেশি ট্যুরিস্ট আসে না। খুন করতে হলে খুনীকে অবশ্যই আমাদের বাড়ির ধারে-কাছে একবার আসতেই হবে।

–কিন্তু ম্যাডাম, তিরিশে আগস্ট কাউকে আপনার বাড়ির ধারে-কাছে দেখা যায়নি।

–কথাটা কার থেকে শুনেছেন? মিস গ্রে কি বলেছে? ওরা কথা একেবারে বিশ্বাস করবেন না। ও একনম্বরের শয়তানি, মিথ্যেবাদী। এই কারণে ওকে আমি মোটেও পছন্দ করতাম না। আমার দুচোখের বিষ। কি ন্যাকা ন্যাকা কথা, আমার কেউ নেই। ছোটোবেলা থেকে লোকের লাথি–ঝাটা খেয়ে বড় হয়েছি। তাতে কি হয়েছে বলুন? তোর ভাগ্যে নেই তাই পাসনি। আমার কপাল ভালো, তাই আমি সব পেয়েছি। অত কথা কিসের বাবা। এ বাড়ির দুই নবাব পুত্রের মধ্যে একজন নিয়ে এলো জামা, আবার অন্য জন নিয়ে হাজির হলো নকল মুক্তোর হার। বড়ভাই তো ওর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ছোটো ভাই ভাবে গদগদ হয়ে দশ পাউন্ড মাইনে বাড়িয়ে দিলো। এসব আমি বরদাস্ত করতে

পারি না। তাই গত সোমবার তাকে পরিষ্কার জানিয়ে দিলাম, এখান থেকে তুমি চলে যাও। নিজের আস্তানা নিজে খুঁজে নাও। কথা না বলে সুড়সুড় করে ঘর থেকে সে চলে গেল। তারপরেই ফ্রাঙ্কলিন আমার কাছে এসে হাজির হলো। ও চলে গেলে না কি কথা বলার সঙ্গীর অভাব হবে। তারপর বললো, ওকে তিনমাসের মাইনে অগ্রিম দিয়ে দাও, তাই-ই সই। কিন্তু ওর চেহারা আমি এই বাড়ির ধারে-কাছে দেখতে চাই না। আমি অসুস্থ তাই আমাকে সকলে সহানুভূতির চোখে দেখে। আমি ঝোঁকের মাথায় যা বলি, সেটা ওরা শুনে নিতে বাধ্য হয়। ফ্রাঙ্কলিনও কোনো আপত্তি করলো না।

লেডি ক্লার্ক একটানা বেশ কিছুক্ষণ কথা বলার পর হাঁফাতে লাগলো। নার্স বললো– আপনি বরং একটু শুয়ে বিশ্রাম নিয়ে নিন।

-থাক, আর সোহাগ দেখাতে হবে না। তোমাকেও আমি হাড়ে হাড়ে চিনেছি। ঐ শয়তানির সঙ্গে তোমারও কম দরদ ছিল না।

–আপনি মিস গ্রে-কে মিথ্যাবাদী বললেন কেন? পোয়ারো প্রসঙ্গ পাল্টে প্রশ্ন করলো।

–মিথ্যেবাদী নয়তো কি। আপনাকে বলেছে বাড়ির আশেপাশে কোনো উটকো লোককে সে দেখেনি। অথচ আমি জানালার সামনে চেয়ারে বসে সব কিছু লক্ষ্য করেছিলাম। একজন অচেনা লোকের সঙ্গে সে কথা বলছে। সে দাঁড়িয়ে ছিল উঠানে। আর লোকটা ফটকের বাইরে ছিল। প্রায় এগারোটা হবে। লোকটির চেহারা সাধারণ। লম্বা, রোগা, নোংরা পোশাক পরনে-ব্যস। এইটুকু মানে...মি. পোয়ারো, আমার শরীর ভীষণ খারাপ লাগছে, আপনারা এখন আসুন। নার্স...নার্স।

ইচ্ছা না থাকলেও আমাদের বাধ্য হয়ে ঐ ঘর ত্যাগ করতে হলো।

–এতক্ষণে মিস গ্রে আর ঐ লোকটার গল্প শোনা গেল। আমি বললাম, মিস গ্রে এমন একটা খবর কেন চেপে গেল?

–এই কেন-র জবাব আমাকে এখন আবিষ্কার করতে হবে। সময় ও সুযোগ হলে তাকেই একদিন প্রশ্ন করবো।

আশ্চর্য, এমন সুন্দরী শিক্ষিত মহিলার সঙ্গে একটা পাগলের যোগসাজস, এ কল্পনা করা যায় না। সে সুন্দরী বলেই সকলে অপমান করার জন্য আদাজল খেয়ে লেগেছে।

-না হেস্টিংস, তোমার কথায় আমি সায় দিতে পারলাম না। সবাই আদাজল খেয়ে লেগেছে, কিন্তু স্যার কারমাইকেল, ফ্রাঙ্কলিন, নার্স ক্যাপস্টিক, এঁরা?

-লেডি ক্লার্কের নাম তো বললেন না?

-বললাম তো। তোমাকে কেবল তিনের সঙ্গে একের ফারাকটা বুঝিয়ে দিলাম।

হোয়াইট হ্যাভেনে ঢুকতেই রিসেপশনিস্ট জানালো, অনেকক্ষণ ধরে এক ভদ্রলোক পোয়ারোর সঙ্গে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করছে। সে তার ফ্ল্যাটের সামনে পায়চারি করছে, খানিক আগে এক বেয়ারা দেখে এসেছে।

লিফট থেকে বেরোতেই নজরে পড়লো ডোনাল্ড ফ্রেসার অপেক্ষা করছে। এই সময় ওকে আশা করিনি, তাই আশ্চর্য হলাম। তার চেহারায় একটা বিধ্বস্ত ভাব। মনে হয় গত দুদিন তার ওপর দিয়ে অনেক ধকল গেছে।

বেশ কিছু কথা হলো।

একসময় আমি জানতে চাইলাম, আপনি কি সরাসরি বেক্সহিল থেকে আসছেন?

-হ্যাঁ।

–মিস হিগলিকে কায়দা করতে পারলেন?

–ও, ঐ কাফের মেয়েটা। না, তার ব্যাপারে মাথা ঘামাবার সুযোগ আমার হয়নি।

–তাহলে আপনি ওখান থেকে চলে এলেন?

–কি জানি, তা বলতে পারবো না।

–এটা কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর হলো না। পোয়ারো আপনার মনের খবর সব জানে।

-আমি জানি, পোয়ারো বললো গত আটচল্লিশ ঘণ্টা ধরে মনের মধ্যে যে কথাটা পুষে রেখেছেন আপনি, কাউকে বলতে পারেননি, সেটা আমাকে জানাতে এসেছেন। আপনার যা বলার আছে নির্ভয়ে বলতে পারেন সঁসিয়ে ফ্রেসার।

–আপনি যদি আমার কথা বিশ্বাস করেন, তাহলে বলতে পারি। আচ্ছা, মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনি কি স্বপ্ন বিশ্বাস করেন? একটা ভীষণ বাজে স্বপ্ন বীভৎস ভয়ঙ্কর। আমি হয়তো স্বাভাবিক নই। হয়তো শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে যাবো। রাতের পর রাত এক স্বপ্ন আমাকে অস্থির করে তুলেছে। আমি বালিয়াড়িতে বেটির জন্য অপেক্ষা করছি। কিন্তু তাকে আমি কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না। বেটির বেল্ট আমার হাতে, তাকে সেই বেল্ট ফেরত দিতে হবে। আমি সকলের মুখ পর্যবেক্ষণ করতে লাগলাম, নিখুঁতভাবে দেখলাম, আচমকা তার সাক্ষাৎ পেলাম আমি। সমুদ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। জলের ঢেউ গুনতে গুনতে সে যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। আমি তার দিকে ধীর পায়ে এগিয়ে গেলাম। সে কিছু টের পেল না। অবশেষে আমি তার ঠিক পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল ঘটনাটা। আমার হাতের বেল্ট তখন তার গলায় জড়িয়ে গেছে। আমি আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে বেল্টটা টানতে লাগলাম। ব্যাস, তার নিষ্প্রাণ দেহটা বালির ওপর লুটিয়ে পড়লো। আমার তখন আনন্দ ধরে না। আমি তাড়াতাড়ি তার দিকে ঝুঁকে পড়লাম। দেখি, ও বেটি নয়, ওর দিদি মেগান।...আমি এ স্বপ্নের মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছি না। চোখ বুজলেই সেই দৃশ্য ভেসে উঠছে মনের পর্দায়।

ফ্রেসারকে ক্লান্ত দেখালো। পোয়ারো তার দিকে ব্র্যান্ডির শিশি এগিয়ে দিয়ে কিছুটা গলায় ঢালতে বললো, ও আপত্তি না করে সবটা ব্র্যান্ডি গলাধঃকরণ করলো, শিশিটা পোয়রোর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো–আচ্ছা, এই স্বপ্নের অর্থ কি? আমি কি তাহলে বেটির খুনী?

পোয়ারো জবাব দিতে গিয়ে বাধা পেল। চিঠির বোঝা হাতে নিয়ে ডাকপিওন এসে ঢুকলো।

www.bengaliebook.com

চিঠির ঠিকানায় চোখ বুলিয়ে আমি সভয়ে চিৎকার করে উঠলাম।

–পোয়ারো এসেছে।

আমরা দুজনে টাইপ করা চিঠিটা সামনে মেলে ধরলাম।

.

কি মশাই, এখনও কি অন্ধকারে অন্ধের মতো হাতড়ে বেড়াবেন, না কি এ পর্ব শেষ করবেন? শেষ না করলেও ক্ষতি নেই, লজ্জাও নেই। চলুন, আমরা এক নতুন জায়গায় নতুনভাবে খেলাটা শুরু করি।

বেচারা পোয়ারো। আপনার দুঃখ দেখে আমার চেঁচিয়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে।

আপনি কি শাস্ত্র-টাস্ত্র মানেন? যদি মানে, তাহলে এই সুবাদে একটা উপদেশ দিই। কি যেন কথাটা...উদ্যমেন হি সিদ্ধন্তি। তার মানে উদ্যম থাকলে সব কিছু সফল হয়। অতএব যতদিন বেঁচে আছেন, হাল ছেড়ে না দিয়ে লড়াই করে যান। একদিন না একদিন সুফল পাবেন-ই।

ধরুন না, আমাকে। আমার উদ্যম দেখছেন তো, আপনাকে কেমন একের পর এক বোকা বানাচ্ছি। তবে ভাববেন না, সহজে আমি রণে ভঙ্গ দেবো।

যাক, আসল কথায় আসি, এবার কোথায় খেলাটা হবে বলুন। টিপারারি..? না। ওটা আমার বর্ণমালার কুড়ি নম্বর খুনের পর্যায়ে পড়ে। হিসেবমতো ক্রমিক সংখ্যা অনুযায়ী ...চার..পাঁচ... সতেরো...আঠারো..কুড়ি। অতএব মাঝখানে ষোলটা সংখ্যা রেখে আমি কোন সাহসে কুড়ির দিকে এগোই বলুন।

যাক, আপাতত ও কথা স্থগিত থাক। আপাতত আমরা চলুন যাই ডন কাস্টারে। হাতের কাছে চার নম্বর রয়েছে ওটার একটা গতি করে নিই।

ইতি
বশংবদ
এ.বি.সি.

চিঠিটা পড়ে আমি উৎকণ্ঠিত হলাম না। বরং খুশী হলাম। এতদিনের সমস্ত উৎকণ্ঠা চতুর্থ চিঠির কল্যাণে ধুয়ে মুছে গেল। তাই স্বাভাবিক ভাবেই দুশ্চিন্তার পরিবর্তে শান্তি পেলাম, স্বস্তি পেলাম।

ক্রোমকে ফোন করে জানানো হলো। পনেরো মিনিট বাদে সে এসে হাজির হলো। দশ মিনিটের মধ্যে মেগান বার্নাড, ফ্রাঙ্কলিনও এসে গেল। মেগান সোজা বেক্সহিল থেকে আসছে।

পোয়রো চিঠি সম্বন্ধে সব কিছু ক্রোমকে জানালো। ক্রোম চিঠিটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। চিঠি সম্পর্কে স্যার লায়নেল কি বলে সেটা পোয়ারোকে জানাতে বললো।

ফ্রাঙ্কলিন তার দিকে তাকিয়ে বললো–চিঠিটা তো পকেটে পুরে নিলেন। কিন্তু কাজের কাজ কিছু করবেন কি? এগারোই সেপ্টেম্বর ডন কাস্টারে যে মরশুমের শেষ ঘোড়দৌড়, সেটা কি জানেন? ঐ খেলা উপলক্ষ করে ডান কাস্টারে কত লোক জমা হয় জানেন? সারা ইংল্যান্ড ওখানে গিয়ে ভিড় করে। পায় পঞ্চাশ হাজার। আর যাই হোক, খুনী পাগল হতে পারে, কিন্তু চাল সে ঠিক দেবে।

পোয়ারো বলল–সত্যি, মিঃ ফ্রাঙ্কলিন, আপনাকে প্রশংসা করতে হয়। এমন বিপদের দিনেও আপনার বুদ্ধি লোপ পায়নি।

-না না, এতে প্রশংসা করার কি আছে। কথাটা মনে পড়লো, তাই বললাম। তবে আমার ধারণা, এবারের খুনটা হয়তো রেসের মাঠেই হবে।

ক্রোম বিদায় নিয়ে চলে গেল। ওর চলে যাওয়ার ভঙ্গি দেখে আমরা হেসে উঠলাম। এমন সময় থরা ঘরে এসে ঢুকলো। মাথায় কালো টুপি, পরনে পা অবধি ঢাকা বর্ষাতি। ভিজে ছাতাটা রেখে বললো, যা শুনলাম সব কি সত্যি?

–কি শুনলেন? কে-ই বা বললো আপনাকে?

মিঃ ক্রোম বললেন। বাড়িতে ঢোকার মুখে তার সঙ্গে দেখা হলো। চিঠিটা সত্যি এসেছে। এবার ঘটনাস্থল কোথায়?

–ডন কাস্টার।

–কবে?

বুধবার, এগারোই সেপ্টেম্বর।

–এখন কি করণীয়?

–আপাতত ভবিষ্যতের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে।

...পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে ঠিক করা হলো, ঘটনার দিন আমরা সবাই ডন কাস্টারে হাজির থাকবো। সন্দেহজনক কিছু নজরে পড়লে প্রথমে স্থানীয় থানায় জানাবো। আমাদের অত্যন্ত সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে। যদি দল থেকে ছিটকে যাই তাহলে ঝুঁকি নেবো না। মনের জোর অক্ষুণ্ণ রেখে আমরা সত্যের ও ন্যায়ের পথে এগোবো। তাতে যে যতটুকু জানি

পোয়ারোর কথার মাঝখানে থরা ও ফ্রাঙ্কলিন বলে উঠলোনা না, আমরা তার সম্বন্ধে কিছু জানি না। জানত আমরা তাকে কোনোদিন দেখিইনি বা কেউ কথা বলিনি। বারবার মনে করার চেষ্টা করছি, কিন্তু কোনো লাভ হয়নি।

–লাভ হত। যদি না আমরা কেউ সত্য গোপন করতাম। পোয়ারো বলতে থাকে। মিস গ্রে, কারমাইকেলের মৃত্যুর দিন বেলা এগারোটার সময় বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে এক অচেনা লোকের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। সে কথা উনি আমাদের জানাননি।

–এসব কথা আপনি কোথা থেকে শুনলেন! উত্তেজনায় থরা লাফিয়ে উঠলো। পরক্ষণে সে শান্ত হয়ে বললো, আসলে লোকটি যুদ্ধ ফেরত এক ফেরিওয়ালা। চাকরি নেই, তাই রোজগারের ধান্দায় বাড়ি বাড়ি মোজা বিক্রি করে বেড়ায়। আমাকে উঠোনে দেখতে পেয়ে আমাকে ঈশারা করে ডাকে। আমি এগিয়ে যেতেই আমাকে মোজা দেখায় এবং কেনার জন্য খোশামোদ করে। লোকটা নাছোড়বান্দা। দশ মিনিট পর সে বাক্স গুছিয়ে চলে গেল। আমিও তারপর লেডি ক্লার্কের সঙ্গে দেখা করতে চলে যাই।

পোয়ারো নিজের চিন্তার মধ্যে ডুবে গেল। কিছুক্ষণ কাটলো এইভাবে, একসময় আমাকে লক্ষ্য করে বললো, মনে আছে, মিসেস এ্যাস্বারের আলমারি ঘেঁটে অনেক কিছুর সাথে একজোড়া নতুন মোজা পাওয়া গিয়েছিলো। তারপর বেক্সহিল। মাত্র দুদিন আগে মিস মেগান এই ঘরে বলেছিলেন, সদ্য কেনা মোজা হাতে নিয়ে তার মায়ের আকুল কান্নার কথা...কি তাই না মাদমোয়াজেল বার্নার্ড?

-হ্যাঁ, ঠিক তাই।

–আর এক ফেরিওয়ালার কাছ থেকে মোজা জোড়া কিনেছিলেন, তাই না?

–হ্যাঁ।

–তাহলে দেখুন, কি বিচিত্র লোক সেই ফেরিওয়ালা। ঘটনা ঘটার আগে বা পরে তাকে ঠিক ঘটনাস্থলে দেখা যাচ্ছে। মিসেস এ্যাস্বার তাকে দেখেছে, মিসেস ফাউলার তাকে দেখেছে, মিস গ্রে-এবার বলুন মাদমোয়াজেল, তার চেহারাটা কেমন দেখতে ছিল?

-মনে আছে কি? মানে, আট-নদিন তাকে দেখেছি তো...গায়ে একটা পুরানো ওভারকোট ছিল...হাঁটে কুঁজো হয়ে হয়ে তবে অল্প...আর কিছু মনে পড়ছে না, তেমন কোনো তার চেহারার বৈশিষ্ট্য নেই যে মনে থাকবে।

নিশ্চয়ই, মনে রাখার মতো চেহারা হলে আমাদের মধ্যে কারো না কারো চোখে সেই চেহারা ভেসে উঠতো। মিস মাদমোয়াজেল, আপনি তার যে চেহারার বর্ণনা দিলেন, তাতে আমার কাজ হবে। ঐ অপরিচিত লোকটিকে আমি চিনতে পারছি।

'এটাকে আবার ক্যাপ্টেন হেস্টিংস-এর লেখা বলে মনে করবেন না।'

কাস্ট বসে আছেন স্থির হয়ে, যেন একটা পাথরের মূর্তি। নড়ে না, চড়েও না। কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় সেই বিজ্ঞাপনটা তাকে ভীষণভাবে ভাবিয়ে তুলেছে। মনের গভীরে উথালপাথাল শুরু হয়েছে।

ঘরে এসে ঢুকলো বাড়ির মালিক মার্থারি। কাস্ট তাকে দেখে চমকে উঠলো। ব্রেকফাস্ট যেমন ঠিক তেমন পড়ে আছে। চা জুড়িয়ে জল। মাথারি জানতে চাইলো, তার শরীর ভালো আছে কিনা? কাস্ট তখন উত্তেজনায় কাঁপছে। কোনোরকমে জবাব দিলো–আজ আমি বেলতেন হ্যাঁমে যাবো।

-ভারি সুন্দর জায়গা, নিরিবিলি। ব্রিস্টন হয়ে যেতে হয়। একেবারে জমজমাট, মিসেস মাথারির চোখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। কাস্টের হাত থেকে পড়ে যাওয়া খবরের কাগজটা তুলতে তুলতে বলে উঠলোকাগজ খুললেই কেবল একটাই খবর..এ.বি.সি...খুন...তদন্ত... এবার নাকি খুনটা ডন কাস্টারে হচ্ছে। সত্যি, ওখানকার লোকদের কি অবস্থা, একবার ভেবে দেখুন। যদি আমার নামের প্রথম অক্ষর ডি হত তাহলে আমি তিলমাত্র দেরি না করে বোঁচকা-বুচকি নিয়ে এখান থেকে সরে পড়তাম। কি মিঃ কাস্ট, কিছু বললেন?

-না...কিছু বলিনি...

এবার এগারো তারিখে কাজটা সম্পন্ন হবে। ঐ দিন জমজমাট থাকবে এলাকা। তবে পুলিশ বসে নেই, উঠে পড়ে লেগেছে। ...একি আপনার মুখ চোখ অমন দেখতে লাগছে কেন, যেন রক্তশূন্য। শুনুন, আজ আর বেরোবেন না। আমার কথা শুনুন।

দেখুন, আপনার কথা মানা সম্ভব নয়। আগে আমার কাজ, আমি কথা দিয়েছি। কথার খেলাপ করা চলবে না, কাজ শেষ করে তারপর অন্য চিন্তা। শরীর আমার ভালো আছে...কেবল একটু ক্লান্ত লাগছে আর কি।

তিনি তৈরি হয়ে নিলেন পোশাক পরে। স্যুটকেস গুছিয়ে বেরোতে গিয়ে দেখেন মিস লিলি তার দিকে তাকিয়ে হাসছে।

মিঃ কাস্ট, আজ এত তাড়াতাড়ি বেরোচ্ছেন?

জরুরী কাজ পড়ে গেছে...না বেরোলেই নয়।...আচ্ছা, মিস লিলি, আপনার মনে কখনো বিপদের আশঙ্কা জেগেছে? আপনি কি ভাগ্য মানেন?

-মানে...ঠিক...। এক একদিন সকালবেলা উঠে মনটা এমন ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে যে সারাদিন কোনো কাজ করতে ভালো লাগে না।

-ঠিক বলেছেন।

–তা এখন কোথায় যাচ্ছেন?

–অ-নে-ক দূর। বেলতেন হ্যাম।

–দেখুন, সেদিন টকিতে তো আপনি এ.বি.সি গণ্ডীর মধ্যে ঢুকে পড়েছিলেন। এবার আর সে ভুল করবেন না।

-না না, ক্ষেপেছেন। আর ভুল করি। এবার সাত মাইল...অনেক দূর..

-সাত মাইলকে আপনি অনেক দূর বলছেন কি করে? হয়তো রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে খুনীটার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে। অচেনা একটা উটকো লোক...

–আমরা তাকে কেউ দেখিনি, কেউ চিনি না। না, আর দেরি করা চলবে না। আপনার মায়ের ভালোবাসার কথা আমার সবসময় মনে থাকবে...চলি...হয়তো আর ফিরবো না, গুডবাই...

তাঁর চলে যাওয়ার দিকে মিস লিলি একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো।

' এটাও কিন্তু ক্যাপ্টেন হেস্টিংস-এর লেখা নয়।'

ক্রোম এক সার্জেন্টকে ডেকে নির্দেশ দিলো, লন্ডনের সমস্ত প্রতিষ্ঠানের কোথায় কোন মোজা তৈরি হয়, সেইসব কারখানার এজেন্টদের সমস্ত খবর সংগ্রহ করে কাল দুপুরের মধ্যে যেন পাঠিয়ে দেয়।

পোয়রোর কথায় আহ্লাদিত হয়ে বড় কর্তা হুকুম দিলেন, পোয়ারো কই বলতে পারলেন না তো, আজকাল কোন খুনীরা চালাক হয়ে গেছে, তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমাদেরও

চালাক হতে হবে। তা না, আলোচনা? হঠাৎসার্জেন্টের দিকে চোখ ফিরতে, তাকে চলে যেতে বললো।

‘এটাও কিন্তু হেস্টিংসের লেখা নয়।‘

লিলির কানে কানে ফিসফিস করে টম হার্টিগাম বললো–তোমাদের ঐ গোবেচারা বুড়ো ভাড়াটেকে দেখলাম। ইউস্টেন স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। নিজের মনে হতাশ হয়ে কি সব যেন ভাবছিল। তার হাত থেকে খবরের কাগজটা পড়ে গেল। খেয়াল নেই। আমি কাগজটা তার হাতে তুলে দিলাম। আমাকে অনেক ধন্যবাদ জানালো। মনে হলো না, আমাকে চিনতে পেরেছে বলে।

–তুমি কোন স্টেশনের কথা বললে, লিলি বললো ইউস্টেন না ব্রিস্টন?

–ব্রিস্টন?

–মনে হয় দুটোর সঙ্গে তুমি এক করে ফেলছে।

–কি বলছো, আমি নিজের চোখে দেখেছি।

–বেলতেন হ্যামে যেতে হলে ব্রিস্টন হয়ে যেতে হয়।

–ডন কাস্টারে সে যাচ্ছিলো। তাই ইউস্টেন নেমে গাড়ি পাল্টাতে হবে।

–এত কথা তোমাকে কে বললো?

–বাঃ, কাগজটা তুলতে গিয়ে ভাজ থেকে টিকিকটা পড়ে গিয়েছিল। আমিই তো সেটা কুড়িয়ে তার হাতে দিলাম। তাকে যাই ভাবো, আসলে সে প্রফেসার...ডন কাস্টারে ঘোড়দৌড়ের মরশুমের পড়ে পাওয়া চোদ্দো আনার লোভ সামলাতে পারে না।

–আসলে এমন অদ্ভুত ধরনের লোক, যার নিজের সম্বন্ধে ভালো-মন্দ জ্ঞান নেই। আমরা তো সেবার তার জন্যে ভেবেই অস্থির। কার্স্টনে যখন খুনটা হয় তখন সে ওখানেই ছিলো।

-সে কি বসে থাকার লোক। এরা হলো কাজ পাগল। হয়তো এমন হতে পারে খুনের কদিন আগে বা পরে তাকে বেক্সহিলে আসতে হয়েছে।

বেক্সহিল...বেক্সহিল...ঠিক কথা মনে করেছে তোতা। বেটি বার্নার্ড যেদিন খুন হলো, তার ঠিক দুদিন আগে সে বেহিলে যায়, ফিরে আসে ঘটনার তিন দিন পর।

মনে হয়, এ সেই পাগল খুনী। টম নিজের রসিকতায় হেসে উঠলো।

তারপর শুরু হলো নাচ। বাজনার তালে তালে নাচতে নাচতে বেশ কিছু সময় কেটে গেল।

তারপর...?

এগারোই সেপ্টেম্বর। আমরা সদলবলে হোটেলে আস্তানা গেড়েছি, পাশাপাশি দুখানা ঘর, একটি মহিলাদের জন্য অন্যটিতে পুরুষরা থাকবে।

বিশাল জনসমুদ্র। আমি, পোয়ারো, মিস গ্রে-র পক্ষে কি সম্ভব সেই এ.বি.সি.-র রত্নটিকে খুঁজে বের করা?

–যদি ক্ষণিকের জন্যও দেখে থাকে তাহলে ঠিক চিনতে পারবে। এটা স্কুল কলেজে পড়ার সময় বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার একটি নমুনা। আলোর সাত রঙের চাকতিটাকে বনবন করে ঘোরালো, সাতটি রঙ আর আলাদাভাবে দেখা যায় না কেবল সাদা রঙ চোখে ভাসে। আবার যখন থামাবে তখন আর সাদা রঙ দেখতে পাবে না।...তাছাড়া রাস্তার অলিতে গলিতে পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ। ক্রোম যে একজন পাকা ইনসপেক্টর সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আমি জানি, খুনী তার প্রতিজ্ঞা পূরণের জন্য সচেষ্ট হবেই। তেমনি আমাদের চোখ-কান খুলে চলতে হবে।

আমাদের এবার বেরোতে হবে। তৈরি হয়ে নিলাম।

এমন সময় ফ্রাঙ্কলিন এলো। পোয়ারোর কানে কানে কি যেন বলছে, সেটা শোনার চেষ্টা করলাম।

-মানে, আপনি যে সেদিন কার্স্টনে গেলেন। আমার বৌদির কথা বললেন...কোনো ইঙ্গিত বা প্রস্তাব...

পোয়ারো হেসে বললো–আপনি ঠিক কি বলতে চাইছেন?

–এই পরিবেশে যদিও নিজের ব্যক্তিগত কথা নিয়ে আলোচনা করা উচিত নয়। তবুও... জানতে ইচ্ছে করছে...জানেন, বৌদিকে আমি মায়ের মতো শ্রদ্ধা করি। সেও আমাকে ভালোবাসে। কিন্তু ওর অসুখটা যত অশান্তির কারণ। ঝোঁকের মাথায় কখন যে কি বলে বসেন তার ঠিক নেই। আসলে জানেন তো, মেয়েরা মেয়েদের হিংসে করে। থরা দেখতে সুন্দরী। থরার নামে প্রশংসা শুনলে সে তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে। সে কি থরার নামে আপনাকে...জানেন, দাদাও থরার প্রশংসা করতো, অবশ্য তার মন ছিলো নিষ্পাপ। সে থরাকে নিজের মেয়ের মতো স্নেহ করতো।

ফ্রাঙ্কলিন পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে দেখালো–এই চিঠিটা দাদা আমাকে লিখে পাঠিয়েছিল। তখন আমি মালয়ে ছিলাম।

চিঠির বয়ান ছিল–

আমরা ভালো আছি। তোমার বৌদির শরীরের কিছুটা উন্নতি হয়েছে। নিশ্চয়ই থরা গ্রের কথা তুমি ভুলে যাওনি। সত্যি মেয়েটি আমাকে বাঁচিয়েছে, যেমন চটপটে তেমনি চালাক। কথা বলার আগেই তার কাজ শেষ। থরা না থাকলে আমার এত দিনের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যেতো। শখের জিনিস নিয়ে লোকের কাছে গর্ব করার মতো আমার হয়তো আর কিছুই থাকতো না।

...মেয়েটার গুণের কথা বলে শেষ করা যায় না। চীনের জিনিসপত্র সংগ্রহের ব্যাপারে আমার যেমন আগ্রহ, ওরও তেমনটি ছিল। মাঝে মাঝে আমার কি মনে হয় জানো, যদি

ওর মতো আমার একটা মেয়ে থাকতো। কিন্তু ভগবান আমাকে সব কিছু দিয়েছেন, কেবল এদিক থেকে বিমুখ হয়ে আছেন।

তারপর চিঠিটা পকেটে রেখে ফ্রাঙ্কলিন বললো, দাদা তার দুঃখ ভুলতে চেয়েছিলো, দাদার ভালোবাসার মহত্ত্বটা বৌদি বুঝতে পারেনি। তাই তো থরাকে বেড়ালের মতো তাড়িয়ে দিলো। ব্যাপারটা ভালোভাবে খতিয়ে পর্যন্ত দেখলো না। যাক, আপনাকে কি তার সম্বন্ধে কিছু বলেছে?

সেটা সম্পূর্ণ আমার ব্যাপার। আমি নিজের বুদ্ধিকে ভীষণ শ্রদ্ধা করি। তাই কেউ কিছু বললেও আমার বিশ্বাসে আঘাত হানতে পারে না।

আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম, এগোতে গিয়ে বাধা পেলাম। পোয়ারোর ইশারায় দাঁড়িয়ে পড়লাম–শুভ কাজে যাচ্ছি...একটা পেঁচার ডাক শুনতে পেলে?

বুঝলাম পোয়ারোও আমাদের সঙ্গ নিয়েছে। ওর জুটি কে সেটা জানতে চাইলাম, আমি জানি, সুন্দরী মহিলাদের সঙ্গে সময় কাটাতে সে ভালোবাসে,তাই আমি ওর জন্য মেরি বার্নার্ডকে পছন্দ করলাম। যেহেতু বর্ণমালার চতুর্থ অক্ষর দিয়ে ওর পদবী শুরু।

কিন্তু পোয়ারো গররাজী হলো। এ বয়সে ঝুঁকি না নেওয়া ভালো।

‘এটাকে আবার ক্যাপ্টেন হেস্টিং-এর লেখা বলে মনে করবেন না।‘

-বাঃ দারুণ। দারুণ একটা ছবি বটে। শেষের পাখি। প্রত্যেক কটা দৃশ্য দেখবার মতো। আর আহাম্মকটার কাণ্ড দেখ। পয়সা দিয়ে টিকিট কেটে সম্পূর্ণ না দেখে পালাচ্ছে। আর তো দশ মিনিটের মধ্যে ছবি শেষ হয়ে যাবে। এটা দেখেই যেতে পারতো। আর এমনই বোকা, মাথা থেকে টুপিটা পড়ে যাওয়ায় খুঁজতে লাগলো! এতে যে অন্য লোকের অসুবিধা হচ্ছে, সেটা বুদ্ধিতে কুলোচ্ছে না। অন্ধকারে লোকটাকে দেখা গেল না। নতুবা লেড বেটার দুটো কথা শুনিয়ে দিতো।

...সত্যি, অপূর্ব...নায়িকা যেখানে ক্যাথারিন র‍্যায়াল..ইউরোপের বিখ্যাত অভিনেত্রী।...তবে আজ হলে তোক কম। সবাই ছুটেছে ঘোড়দৌড়ের মাঠে।...আর একটা গর্দভ আবার ঘুমোচ্ছে। পেছন থেকে ডেকেও সাড়া না পেয়ে লেড বেটার দরজার দিকে এগোলো।

হঠাৎ পেছন থেকে একটা সোরগোল শুনে সে দাঁড়িয়ে পড়লো। ঘুরে দাঁড়ালো, যেখানে লোকটি ঘুমোচ্ছিল সেখানে লোক ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। কৌতূহলী হয়ে ভিড়ের দিকে এগিয়ে গেল...লোকটি খুন হয়েছে। পাশে এ.বি.সি. ...সবাই আর্তনাদ করে উঠলো-খু...উ...ন।

‘এটাও কিন্তু ক্যাপ্টেন হেস্টিংসের লেখা নয়।‘

রিগ্যাল সিনেমা হল থেকে কাস্ট রাস্তায় এসে পা রাখলেন। মনের গভীর থেকে উঠে এলো বহুদিন আগের এক কথা। ভাবতে ভাবতে একটা সস্তা দামের হোটেলে এসে হাজির হলেন, কাল সকাল থেকে ব্ল্যাক সোয়ানে তিনি অবস্থান করছেন। ঘরে ঢুকলেন তিনি। বাঁ-হাতটা চোখের সামনে তুলে ধরতেই তিনি শিউরে উঠলেন। মণিবন্ধের ঠিক

ওপরে কোটের হাতায় জমাট বেঁধে আছে চাপ রক্ত। পরমুহূর্তে তিনি পকেট থেকে টেনে বের করলেন একটা ছুরি–লম্বায় যেটি দশ ইঞ্চি, তেমনি তীক্ষ্ণ ধার। ছুরির ফলায় রক্ত লেগে আছে। মনে হয় ছুরিটা এখুনি রক্তে ডুবিয়ে আনা হয়েছে।

কাস্ট ছুরির দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে রইলেন। তিনি বিকারগ্রস্ত লোকের মতো ছুটে গেলেন বেসিনের কাছে। দ্রুত ছুরিটা জল দিয়ে ধুয়ে ফেললেন। জল লাল হয়ে উঠলো নিমেষের মধ্যে। হঠাৎ দরজায় করাঘাত। তিনি ত্রস্ত পায়ে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন। সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটি সরল সাধারণ মুখের মেয়ে, হাতে মস্ত বড় একটা বালতি।

সে বলল-স্যার, সকালে আপনি গরম জল আনতে বলেছিলেন।

–কিন্তু আমি যে ঠাণ্ডা জলেই হাত ধুয়ে ফেললাম।

মেয়েটি তাঁর কথা লক্ষ্য করে বেসিনের দিকে তাকালো। তিনি ভয়ে ঘাবড়ে গেলেন। তিনি বললেন–আমার বাঁ হাতটা আজ কেটে গেছে।

মেয়েটির যেন বিশ্বাস হলো না কথাটা, এমনভাবে তার দিকে তাকিয়ে বললো–আহা রে! মেয়েটা চলে গেল।

কাস্ট আতঙ্কিত হলেন–তবে কি...না। তিনি দেরি না করে হোটেল থেকে চুপি চুপি বেরিয়ে পড়লেন। বড় রাস্তায় এসে একটু ভাবলেন, তারপর স্টেশনের দিকে পা বাড়ালেন।

ভিড়ের মধ্যে মিশে যেতে হবে আমায়।...আর ভাগ্য যদি এবারেও সুপ্রসন্ন হয় তাহলে আমার আর নাগাল পায় কে?

'এটাও কিন্তু ক্যাপ্টেন হেস্টিংসের লেখা নয়।'

মিঃ লেড বেটারকে খুব উত্তেজিত দেখালো। বললো-ইনসপেক্টর, ভাবতেই অবাক লাগছে মিঃ উন্মাদ খুনীটা আমার কাছেই ছিল বসে। সে পকেট থেকে রুমাল বের করে ঘন ঘন মুখ মুছতে লাগলো।

ক্রোমের মধ্যে কোনো ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেল না। স্বাভাবিকভাবে বললো, ব্যাপারটা আগে ভালো করে বুঝতে দিন। আগে বলুন, লোকটার চেহারা কেমন ছিল? সে কি খুঁড়িয়ে হাঁটছিল না সোজা হয়ে?

চেহারা...লম্বায় প্রায় ছফুট, জোয়ান দেখতে। অন্ধকারে ভালো করে দেখতে পাইনি ঠিকই, তবে মাথার মাঝখানে টাকটা চকচক করছিলো, মুখচোখের গড়নও ভারী বিশ্রী। কিছুক্ষণের জন্য থেমে বলতে থাকে-স্যার, আপনি ঠিকই বলেছেন, কিছুটা খুঁড়িয়ে হাঁটছিল।

আরো কয়েকটি প্রশ্ন সেরে নিয়ে ক্রোম নোটবুকে লিখে নিলো। যারা ঘটনাটা নিজের চোখে দেখেছে তাদের মধ্যে একজন মিলিটারি ডাক্তার ছিল। ক্রোম তার কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো ডাঃ জেমসন, কি কি দেখেছেন, বলুন তো?

ছবি শেষ হয়েছে। বেরোবার জন্য পা বাড়ালাম। এমন সময় পেছন থেকে চাপা আওয়াজ কানে এলো। জেমসন বলতে থাকে, আমি পায়ে পায়ে সেখানে গেলাম, দেখি একটি লোক চেয়ারের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। তার চারপাশে লোক ভিড় করে আছে। আমি সকলকে সরিয়ে এগিয়ে গিয়ে নোকটার কপালে হাত রাখলাম। একেবারে ঠান্ডা। লোকেরা ঐ লোকটিকে চেয়ারে সোজা করে ঠিক করে বসিয়ে দিলো। ওর এখন হাওয়া প্রয়োজন মনে করে কোটের বোম খুলতে গিয়ে চমকে উঠলাম। বাঁ পকেটের হাত থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরে পড়ছে। তার পাশে পড়ে আছে এ.বি.সি. একটি গাইড। ঠিক সেই সময় একজন তোক তারস্বরে চিৎকার করে উঠলো-খু-উ-ন।

–গাইডখানা হাতে নিয়ে দেখেছিলেন?

–না, গাইডে হাত দিইনি।

কর্নেল এন্ডারসন ঘরে এসে ঢুকলো।

এবারেও এ.বি.সি.-র কাছে হার স্বীকার করতে হলো। কিন্তু সবদিকেই তো সতর্ক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। ব্যবস্থায় এতটুকু ফাঁক ছিল না।...কিন্তু খুনটা শেষ পর্যন্ত হয়ে গেল। তবে এবারে ভারী কোনো অস্ত্র দিয়ে আগত করা হয়নি। পেছন দিক থেকে ঘাড় এবং গলার দিকে মাঝখানে ছোরার ফলা ঢুকিয়ে দিয়ে মৃত্যু ঘটানো হয়েছে। লোকটা সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে।

–নিহত লোকটির নাম-ধাম জানা গেছে? পোয়ারো প্রশ্ন করলো।

–হ্যাঁ, নাম জর্জ আর্লর্সফিল্ড। শহরের উত্তর প্রান্তে ওর একটা সেলুন আছে।

–আ-র্ল-স-ফিল্ড...আশ্চর্য, কেমন গড়বড় ব্যাপার।

-ঠিক তাই। এটাও আমার মনে খচখচ করছে। খুন হবার কথা ডি অক্ষরের নামের লোকের। অথচ মৃত্যু ঘটলো দিয়ে শুরু যে ব্যক্তির পদবী...।

ওসব চিন্তা পরে করা যাবে। ক্রোম বলে উঠলো। তার আগে জবানবন্দীর কাজ শেষ করা যাক।

ঘরে এসে ঢুকলো স্যার রজার ম্যানুয়েল ডাউন্স। শান্ত নিরীহ বেঁটেখাটো চেহারার প্রৌঢ় ভদ্রলোক। জানালো শিক্ষকতা তার পেশা, জাইফিল্ড বয়েজ স্কুলে ইংরাজির শিক্ষক। যা যা দেখেছে, তার বর্ণনা দিতে লাগলো-উঁহু, ভাবা যায় না, আমার পাশে পড়ে আছে সদ্য এক মৃতদেহ। ছবি শেষ হতেই আলো জ্বলে উঠেছিল। তখন আমি কিছু খেয়াল করিনি। লোকটি সামনের চেয়ারে বসেছিল। আমি তার পেছনের আসনে ছিলাম, দেখি চেয়ারে মাথা রেখে লেকাটি বসে আছে। আমি তাকে ডাকলাম। কিন্তু ডাকের কোনো প্রতিক্রিয়া তার মধ্যে লক্ষ্য করলাম না। ভাবলাম, নিশ্চয়ই অসুস্থ হয়ে পড়েছে। অতএব আশেপাশের লোকদের ডাকলাম। অনেকেই সেখানে হাজির হলো। ভিড়ের মধ্যে একজন বললো, উনি নাকি মিলিটারি ডাক্তার। আমাদের যদি আপত্তি না থাকে তাহলে লোকটাকে তিনি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। আমরা রাজী হলাম। গায়ে হাত দিয়ে দেখলো, ঠান্ডা হাওয়া-বাতাস লাগার জন্য বাঁ-হাতে তার বুকের বোম খোলার পরে ভেসে উঠলো এক

বীভৎস দৃশ্য। রক্ত...আর পাশে পড়ে আছে এ.বি.সি. গাইডটি। আমি চিৎকার করে উঠলাম। খু-উ-উ-ন।

...চিৎকার করেই নিজের ঝামেলা ডেকে এনেছি। আমি প্রেসারের রুগী। চিৎকার, লাফানো, দৌড়-ঝাঁপ সব কিছু বন্ধ। বিকেল পাঁচটা থেকে সোওয়া আটটা পর্যন্ত কেটে গেছে। আমাকে এখন বাড়ি গিয়ে ওষুধ না খেলেই হবে না।

-মৃতলোকটি আপনার থেকে কত দূরে বসেছিলেন?

–প্রায় পাশাপাশি আমরা বসেছিলাম। ওর আসন নম্বর ছিল তিন, আমার ছিল চার নম্বরের চেয়ারটি। কিন্তু আমার ঠিক সামনেই এক লম্বা-চওড়ার ভদ্রমহিলা বসেছিলো। আমার ছবি দেখতে অসুবিধা হচ্ছিল। তাই আমি পাঁচ নম্বরে গিয়ে বসি।

এন্ডারসন বললো–মিঃ ডাউন্স আপনি ভাগ্যবান পুরুষ, নিঃসন্দেহে।

-কেন? একথা বলার কারণ?

–এত বড় বিপদের থেকে রক্ষা পেলেন।

–বিপদ আমার, বিপদ-আপনি কি বলছেন? কিছুই তো মাথায় ঢুকছে না।

–বুঝবেন কি করে? এ.বি.সি.-র লক্ষ্য যখন স্বয়ং আপনি..

–আমি?

-আপনার পদবীর প্রথম অক্ষর বর্ণমালার চার নম্বরে আছে। আপনিই ছিলেন খুনীর লক্ষ্য। সেইজন্য সে ওখানে গিয়েছিলো। কিন্তু আপনার ভাগ্য সুপ্রসন্ন। না হলে এতক্ষণে...

কথাটা শুনে আতঙ্কিত হয়ে ডাউন্স কাঁপতে লাগলো। আর কোনো কথা না বলে ঘর থেকে চলে গেল।

কনস্টেবল ঘরে এসে জানালো, হোটেল ব্ল্যাক সোয়ান-এর মালিক মিঃ বল এবং একজন মহিলা বিশেষ প্রয়োজনে দেখা করতে চায়।

মিঃ বল এবং মেরি স্ট্রার্ড ঘরে এসে ঢুকলো। মিঃ বল নিজেদের পরিচয় দিয়ে বললো, – বিশ বছর ধরে আমি হোটেল চালাচ্ছি। আর পাঁচ বছর ধরে মেরি আমার হোটেলে আছে। এরকম অদ্ভুত ঘটনা কখনো দেখিনি বা শুনিনি। মেরি বুদ্ধি করে ভাগ্যিস ঘরে ঢুকে পড়েছিল...

-ঘরে? কোন ঘরে?

দোতলার ষোলো নম্বর ঘরে। আপনারা বরং মেরির মুখ থেকে শুনুন। ও যা যা দেখেছে সব বলতে পারবে।

-স্যার, আমি তখন গরম জল নিয়ে দোতলায় ষোলো নম্বর ঘরে গেছি। মেরি বলতে থাকে। দরজা ভেজানো ছিল, আমি টোকা দিলাম। একবার নয়, দুবার। সাড়া পেলাম

না। আমি দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে পড়লাম। দেখি উনি বেসিনে নিচু হয়ে হাত ধুচ্ছেন। আমাকে লক্ষ্য করলে বলে উঠলেন, কি চাই? আমি বললাম, আপনি সকালে গরম জল চেয়েছিলেন, তাই নিয়ে এসেছি। উনি বললেন, গরম জল আর লাগবে না। ঠান্ডা জলেই হাত ধুয়ে ফেলেছি। আমি তার কথামতো বেসিনের দিকে তাকালাম। অবাক হয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম–চাপ চাপ রক্ত বেসিনে, তার কোটের হাতা কনুই পর্যন্ত গোটানো, ঐ পর্যন্ত জলে ভেজা। কিন্তু কাটা ছেঁড়া কিছুই দেখলাম না। ঐ সময় ওকে কেমন হিংস্র দেখাচ্ছিল। আমি দেরি না করে পড়িমরি করে দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসি।

-এটা কখন হয়েছে?

–প্রায় সাড়ে পাঁচটা কি তার থেকে দু-পাঁচ মিনিট এদিক-ওদিক হবে।

–তিন ঘন্টা আগে ঘটনাটা ঘটেছে। আপনারা এত দেরি করে এলেন কেন? এতক্ষণ কী করছিলেন?

–আমরা তো খুনের ব্যাপারটা আগে শুনিনি। শুনলাম এক বোর্ডারের কাছে থেকে। সাড়ে সাতটার খাবার টেবিলে বসে সে সিনেমা হলের খুনের কথাটা বলছিলো। সেই শুনে মেরি তখন আমাদের সব কিছু বললো। আমি তখন দারোয়ান আর মেরিকে নিয়ে দোতলায় ষোলো নম্বরে গিয়ে হাজির হলাম, ততক্ষণে লোকটা হাওয়া হয়ে গেছে।

মেরি, তুমি বলো তো, লোকটার পরনে কি ধরনের পোশাক ছিল? দেখতে কেমন ছিল?

–লোকটার চেহারা লম্বা, ছিপছিপে, একটু খুঁড়িয়ে হাঁটে। চোখে চশমা...গায়ে ছিল পুরানো পা পর্যন্ত ঢাকা একটা ওভারকোট, মাথায় টুপি।

–লোকটার নাম কি? এন্ডারসন প্রশ্ন করলো।

-হা স্যার, রেজিস্টার আমি সঙ্গে করে এনেছি। আপনাদের সুবিধার কথা ভেবে। তারপর মিঃ বল রেজিস্টারটা টেবিলের ওপর খুলে ধরলো।

আমাদের যেন তর সয় না। হুমড়ি খেয়ে সকলে রেজিস্টারের ওপর পড়লাম। দেখলাম প্রথমে বর্ণমালার বড় হাতের অক্ষর দুটি প্রথমে, পদবীর অংশটুকু

এন্ডারসন বিড়বিড় করে বললো, এ.বি. ক্যাস বা কেস? যাই হোক, তিনটি অক্ষর মিলিয়ে নামটা ছোট করলে দাঁড়ায় এ.বি.সি.। ক্রোম মাথা তুলে বলল।

-ঘরে মালপত্র কিছু ছিল?

–মালপত্র বলতে বিরাট একটা সুটকেস। তার মধ্যে অনেকগুলো ছোটো ছোটো পিচবোর্ডের বাক্স। ঐ বাক্সগুলোতে সস্তা দামের একজোড়া করে মোজা ছিল।

ক্রোম খুশির আমেজে পোয়ারোর দিকে হাত বাড়িয়ে বললো-মঁসিয়ে পোয়ারো আপনার ধারণা ঠিক। ইয়ার্ডের তরফ থেকে আপনাকে অভিনন্দ জানাচ্ছি।

‘এটাকে আবার ক্যাপ্টেন হেস্টিংস-এর লেখা বলে মনে করবেন না।‘

স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের নিজস্ব কামরায় দুপুরবেলা ক্রোম বসে আছে। এমন সময় ফোন বেজে উঠলো। ক্রোম রিসিভার তুলে নিয়ে কানে রাখলো। ওপার থেকে জ্যাকবের গলা ভেসে এলো–একটি ছেলে এ.বি.সি.-র ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে। সে তার বক্তব্য আপনাকেই বলতে চায়।

ক্রোম তাকে পাঠিয়ে দিতে বললো।

৪. রহস্যের সংবাদ

এ.বি.সি. রহস্যের সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর পনেরো বছরের কিশোর থেকে আশি বছরের বৃদ্ধের আসা-যাওয়া শুরু হয়েছে। সকলেই চায় রহস্যের জাল ভেদ করতে। দেখা যাক, এই ছেলেটি কি বলে?

মিঃ টম হার্টিগান নামে একটি ছেলে ঘরে এসে ঢুকলো। কাগজের সেই খবরটা পড়ে ক্যামডেন থেকে সে এসেছে।

আপনাকে যে খবরটা দেবো, সেটা আপনাদের কতখানি কাজে লাগবে জানি না, স্যার। সে বলতে থাকে, লিলিদের বাড়ির সেই আধপাগলা গোবেচারা স্বভাবের বুড়ো, নিতান্ত ভালো মানুষ গোছের চেহারা, দেখলে মনে হয় ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানে না, অথচ পেটে তার শয়তানি বুদ্ধি।

–কে লিলি?

–আমার বান্ধবী। লিলি মার্থার। ক্যামডেনে থাকে। নিজেদের বাড়ির কয়েকটা ঘর ভাড়া দিয়েছে। ঐ বুড়োটা গত এক বছর ধরে ওদের বাড়িতে বাস করছে। নাম মিঃ কাস্ট।

–কাস্ট?

–হ্যাঁ, তারপর সে ইউস্টেন স্টেশনের সমস্ত ঘটনা ক্রোমকে বললো। আমি বার বার লিলিকে বলেছি, ঐ লোকটাকে ইউস্টেন স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দেখেছি। লিলি আমার কথা

কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না। ও কেবল বললো, ইউস্টেন না ব্রিস্টন। সেদিন নাকি কাস্টের বেলতেন হ্যাঁমে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সে যাচ্ছিলো ড কাস্টারে। টিকিটটা পড়ে যাওয়ায় আমি তার হাতে তুলে দেওয়ার সময় দেখেছিলাম। লিলি বললো, লোকটার নাকি নিজের ভালো–মন্দ বোঝার জ্ঞানটুকুও নেই। এর আগের খুনের দিন নাকি সে টকি গিয়েছিল। একটু ভেবে লিলি জানালো, বেক্সহিলে যেদিন খুনটা হলো তার দুদিন আগে সে ঐ স্থানের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। তিনদিন পরে সেখান থেকে ফিরে এসেছিল। আমি তাকে তামাশা করে বলেছিলাম, হয়তো লোকটা এ.বি.সি. দলের। শুনে লিলি বললো, ওর নাকি মারতে গেলে হাত কাপে, সে আবার খুন করবে?..স্যার, সেদিন বিকেলের সংবাদে এ.বি. ক্যাস না কেস-এর যে বর্ণনা দিয়েছিলেন তার সঙ্গে কাস্টের একেবারে সাদৃশ্য হয়েছে। এরপর লিলির মাকে সব কিছু বললাম। উনি ভাড়াটিয়াদের রেজিস্টার টেনে বের করলেন। খুলে দেখলেন নাম রয়েছে এ.বি. কাস্ট। আমি, লিলি আর তার মা একসঙ্গে বসে আলোচনা করতে লাগলাম, প্রথম খুনের সময় কাস্ট কোথায় ছিল। ভাবতে, ভাবতে আমরা কোনো সঠিক জবাব খুঁজে পেলাম না। এমন সময় লিলি-ই কথাটা মনে করলো, এ্যান্ডোভারের খুনের আগের দিন ক্যাসাড থেকে ওর এক কাকা এসেছিল ক্যামডেনে। দুদিনের জন্য তিনি থাকবেন। তাই হোটেলের ঘর না নিয়ে লিলির মা তাকে কাস্টের ঘরে থাকতে দিয়েছিল। কারণ ঐ সময় কাস্ট দিন চারেকের জন্য ক্যামডেনে ছিল না।

একটানা কথাগুলো বলে টম থামলো।

-তারপর? ক্রোম আগ্রহ প্রকাশ করলো।

-তারপর আর কি? সময় নষ্ট না করে আপনার কাছে চলে এলাম। বুধবার রাত সাড়ে আটটা নাগাদ কাস্ট ফিরে এসেছে। সেই থেকে ঘরের মধ্যেই রয়েছে। সারাক্ষণ কাগজের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে থাকে আর আপনমনে কি সব বলে। লিলির মার কাছ থেকে আমি এসব শুনেছি।

লিলিদের বাড়ির ঠিকানা দিয়ে টম বিদায় নিলো।

–ঠিক আছে, পারলে আজই একবার কাস্টের সঙ্গে দেখা করে আসবো, ক্রোম টমকে জানিয়ে দিলো।

মিঃ জ্যাকবের কাছ থেকে কার্স্টনের ফাইলটা চেয়ে নিয়ে ক্রোম পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে নিজের মনে বললো, হিস নামে একজন তোক সিনেমা হলের সামনে এক অদ্ভুত লোককে দেখেছিল, ছবি দেখে বেরিয়ে সে নাকি আকাশের দিকে তাকিয়ে বিড় বিড় করে কি সব বলছিল। ফাইল থেকে চোখ সরিয়ে নিলো–যে লোক পরপর চারটে খুনের সময় বাইরে থাকে, তাকে তো সন্দেহ করা যেতেই পারে। ওর ওপর কড়া নজর রাখা প্রয়োজন।

ক্রোম জ্যাকবকে উদ্দেশ্য করে বললো-শুনুন, লোকজন নিয়ে আপনি বরং ক্যামডেনের এই ঠিকানায় চলে যান, আমি স্যার লায়লেনের সঙ্গে কিছু আলোচনা সেরে ওখানে যাচ্ছি।

.

টমকে ইয়ার্ডের ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে লিলি বাইরে ফুটপাথে অপেক্ষা করছিল। টম ফিরে এলো তার কাছে। লিলি উদগ্রীব হয়ে জানতে চাইলো, সে কার সঙ্গে কথা বলেছে? কি কথা হয়েছে ইত্যাদি।

টম ক্রোমের সঙ্গে যা যা কথা হয়েছে সব হুবহু বলে গেল।

-তাহলে ওরা আজই ক্যামডেনে আসছে কাস্টের সঙ্গে দেখা করার জন্য?

–সেরকমই বললো।

–তোমরা দেখছি গোবেচারা নিরীহ লোকটিকে তিষ্ঠোতে দেবে না।

বাঃ, তুমি দেখছি খুনীটার হয়ে ওকালতি শুরু করলে। এখন চুপ করো, যখন কাগজে তোমার মার, তোমার আমার ছবি বের হবে তখন তোমাকে সব বুঝিয়ে দেবো, কেমন। তার আগে তোমার মাকে বলল, আমারে যেন পেট ভরে খাইয়ে দেয়।

হঠাৎ যেন মনে পড়েছে, এমন ভঙ্গিমায় লিলি বললো, এক বান্ধবীকে ফোন করতে হবে। সে একথা বলেই সামনের ডাক্তারখানাতে ঢুকলো ফোন করতে।

.

হাত থেকে রিসিভার নামিয়ে রেখে কাস্ট মিসেস মার্থারির দিকে তাকালেন।

–কোনো খারাপ খবর নাকি? মিসেস মাথারি জানতে চাইলো। ফোনে আপনাকে ডেকে দিতে বললো...আপনাদের তো কোনো ফোন আসে না, গলাটা চেনা লাগলো, মনে হলো লিলির গলা। আচ্ছা মিঃ কাস্ট, মেয়েটি কে?

কাস্ট কি বলবে ভেবে পেল না। আমতা আমতা করে বললো, আমার বোন ফোন করেছিলো। পরশু সকালে ওর একটা ছেলে হয়েছে। পরপর দুটো মেয়ের পর এই ছেলে।

-দারুণ আনন্দের খবর। তাহলে আজ বিকেলে নিশ্চয়ই চায়ের আসর বসছে?

–দুঃখিত, আজ হবে না। আমাকে যেতে হবে বোনের বাড়ি। স্টেশনে থেকে বেশ কিছুটা হাঁটতে হয়। এখনই বেরিয়ে পড়া দরকার। নতুবা রাত হয়ে যাবে। এই বলে কাস্ট দরজার দিকে পা বাড়ালেন।

মিসেস মার্থারি তার পথ রোধ করলো। বাধা দিতে চাইলো।

কাস্ট বললেন-সামনের সপ্তাহে সোমবার বা মঙ্গলবার আবার ফিরে আসব। আর দেরি না করে তিনি বেরিয়ে গেলেন। মিসেস মাথারি বোকার মতো তার চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইলো।

.

কাস্ট উদ্দেশ্যহীনভাবে পথ চলতে লাগলো। চারদিকে মানুষ গিজ গিজ করছে। ফোনটা পাওয়ার পর থেকে ওর মাথা চক্রাকারে ঘুরছে।

...মিঃ কাস্ট, আমি লিলি বলছি, আমি খবর পেলাম, স্কটলান্ড ইয়ার্ডের এক পুলিশ অফিসার আপনার কাছে যাচ্ছেন। সময় আছে, পালিয়ে যান। পালান আপনি...

লিলি...তোমার হৃদয়ে আমার জন্য এত দয়া! তুমি সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে আজীবন বেঁচে থাকো। তোমার ফুলের মতো কোমল হৃদয়ে দুঃখ যেন আঁচড় বসাতে না পারে।

বিদায় লিলি, বিদায়...।

তোমাদের ভালোবাসা আমি মৃত্যুর শেষ দিন পর্যন্ত মনে রাখবো। বিদায়...

আবার নিয়মমাফিক বৈঠক বসলো। বৈঠকে পোয়ারো, স্যার লায়লেন, ক্রোম এবং আমি উপস্থিত ছিলাম।

মিঃ পোয়ারো, স্যার লায়লেন বললো, আপনিও তো এই বয়সে একটা খেল দেখিয়ে ছাড়লেন। আপনার সেই মোজার সূত্র ধরে কাস্টন, বেক্সহিল, এ্যাডোরভারের মোট তিরিশজন লোকের জবানবন্দী থেকে জানা গেছে ঘটনার দিন ভিন্ন ভিন্ন সময় শহরে, শহতলীর বিভিন্ন জায়গায় এক আধপাগলা বুড়োকে তারা মোজা বিক্রি করতে দেখেছে। তাদের কাছ থেকে লোকটার যে চেহারার বর্ণনা পেলাম তার সঙ্গে ব্ল্যাক সোয়ান হোটেলের মেরি স্ট্রাউডের বর্ণনার হুবহু মিল আছে। এমন কি এই খবর পাওয়া গেছে যে বিভিন্ন ঘটনাস্থলের ধারে-কাছে কোনো হোটেলে সে উঠতো।

...আজ সকালে টম নামের ছেলেটির কাছ থেকে সব শুনে আমরা মিসেস মার্থারির সঙ্গে দেখা করেছিলাম। সে জানিয়েছে, মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিট আগে লোকটা সেখান থেকে চলে গেছে। ভাবলাম, ওর ঘরটা একবার দেখে যাই। তাই ছজন গোয়েন্দা নিয়ে আমি ঘরের মধ্যে ঢুকলাম। চারদিকে সতর্ক নজর রেখে দেখলাম। তেমন কিছু ঘরে নেই। সেলফের দিকে এগিয়ে গেলাম। দেখি ওপরের তাকে বেশকিছু পিচবোর্ডের বাক্স। আমি বাক্সগুলি খুলে ফেললাম। বেরিয়ে এলো সস্তা দামের কয়েক জোড়া সিল্কের মোজা।

...নিচের তাকে একটা ভারী পার্শেল দেখে হাতে নিলাম। খুলে ফেললাম। আটখানা এ.বি.সি. গাইড বুক যত্ন করে রাখা ছিল। ঘর থেকে আমরা বেরিয়ে এলাম।

হলঘরের আলনায় একটা পুরোনো ওভারকোট ঝুলছিল। আমাদের মধ্যে একজন আলনার হাতল ধরে টান মারলো। ঠুং করে মাটিতে পড়লো একটা ছোরা, দশ ইঞ্চি লম্বা ইস্পাতের তীক্ষ্ণ ধারালো ফলা। ফলাটার দুধারে তখনও রক্তের ছিটে শুকিয়ে আছে। বুঝতে বাকি রইলো না, এই ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুনী তার চতুর্থ খুনটি সম্পন্ন করেছিল।

ক্রোমের কথা শেষ হতে পোয়ারো নিচু স্বরে বললো-ডন কাস্টারে কাজ শেষ করে অস্ত্র টাকে কেন বোকার মতন বয়ে নিয়ে এলো।

–হয়তো ব্ল্যাক সোয়ানের মেরি স্ট্রাউড ভীষণ তাড়া দিয়েছিল। তাই কোথাও ফেলে রেখে আসার সুযোগ পায়নি।

তবে, লায়নেল বললো, মিসেস মার্থারির বাড়ির ভাড়াটে মিঃ আলেকজান্ডার বোনাপার্টের কাস্ট-ই এ.বি.সি., এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। মিঃ পোয়ারো, আপনি কি বলেন?

-আমি...আবার...হয়তো হিসেবের গরমিল...এখনো আমার পুরোনো হিসেবের উত্তর পেলাম না। কেবল ঘুরে ফিরে একই প্রশ্ন মনে জাগে–এই খুনের কারণ কি? খুনের মোটিভ-ই বা কি? জবাব এখনও অজানা। তাই হিসেবের ফাঁকটুকু ভরাট করা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।

সেদিনের মতো বৈঠক শেষ হলো।

'এটাকে আবার ক্যাপ্টেন হেস্টিংস-এর লেখা বলে মনে করবেন না।'

কাস্ট ঐখানেই দাঁড়িয়ে পড়লেন। ওখান থেকে দাঁড়িয়ে দূরের দোকানটা দেখা যাচ্ছে। খুব ভালো ভাবেই দেখা যাচ্ছে।..কবে যেন এসেছিলাম, সেই জুন মাসের একুশ তারিখে। এখনও দোকানের সামনে সাইনবোর্ডটা ঝুলছে। দোকানের নাম ঝলমল করে নজরে পড়ছে—

এ. এ্যাম্বার।

আর দোতলার জানলায় ওটা কি ঝুলছে..গরাদে দেখছি একটা কাগজ সুতো দিয়ে বাঁধা...কি যেন লেখা...গোটা গোটা অক্ষরে...নজরে পড়ছে না। চশমাটা বের করে চোখে লাগলেন বাড়ি–ভা-ডা-দে-ও-য়া-হ-ই-বে।

তার মানে বাড়িতে এখন কোনো বাসিন্দা নেই, খালি।

দয়া করে দোকানের সামনে থেকে একটু সরে দাঁড়াবেন।

কথাটা শুনে কাস্ট ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন, সবজির দোকানের মেয়েটা তার দিকে তাকিয়ে আছে। তিনি তাড়াতাড়ি সরে দাঁড়ালেন।

খানিক বাদেই ওখান থেকে তিনি সরে পড়লেন। হঠাৎ তার দেওয়ালের দিকে নজর পড়লো। বড় বড় হরফে লেখা একটা পোস্টার সাঁটা।

সাবধান।

হয়ত আপনার পাশের মানুষটাই সেই উন্মাদ এ.বি.সি.। এই নরপিশাচ শয়তানের থেকে নিজে বাঁচুন, অপরকে রক্ষা করুন। মঁসিয়ে এরকুল পোয়ারো বলেন...

মঁসিয়ে পোয়ারো...উনি কি এতদিন কোনো সন্দেহ করে উঠতে পারেননি।

আবার কাস্ট পথ ধরে এগোতে লাগলেন। মনে পড়ে গেল সেই কথাটা। কে যেন বলেছিলেন–মানুষ এক অদ্ভুত জীব। কথাটা শুনে আজ আর বিস্মিত হতে হয় না। নিজেই যখন আজব জীব।...আমাকে অনেকে ব্যঙ্গ করতো, তামাশা করতে...আমি গুরুত্ব দিতাম না।

হঠাৎ তার চিন্তার ছেদ পড়লো। কোথায় এলাম...আলো ঝলমল করছে..লোকজন...পুলিশ... সার্জেন্ট...সত্যি, হাসি পাচ্ছে। কিন্তু হাসতে গিয়েও হাসি

ঠোঁটে এলো না। চোখের সামনে পৃথিবী দুলে উঠলো। মাথা বনবন করে ঘুরছে। জ্ঞান হারিয়ে তিনি লুটিয়ে পড়লেন উঠোনের কেয়ারি করা ঘাসের ওপর।

তেসরা কি চৌঠা সেপ্টেম্বর হবে। বেলা দশটা নাগাদ ডঃ টম্পসনকে নিয়ে জ্যাপ এসে হাজির হলো। এতদিনে পুলিশ কোর্টের একদফা শুনানি হয়ে গেছে। এরপর সরকার বনাম আলেকজান্ডার বোনাপার্ট কাস্টের মামলার দায়রার সোপাদ হয়েছে। শুনানির দিন পোয়ারো হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লো। ফলে আমরা কেউই কোর্টে হাজির থাকতে পারিনি।

কাগজে মামলার খবর ছাপা হয়েছে।

–আসামীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের এমন ফলাও সুযোগ দেওয়ার কি প্রয়োজন ছিল? আমি বললাম।

পোয়ারো আমার কথা শুনে হেসে উঠলো। সেটা ওদের ব্যাপার, ও নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথা করার কোনো দরকার নেই। যদি বিচারে প্রমাণ হয় যে সে প্রকৃতিস্থ নয়, পাগল, তাহলে বেকসুর খালাসের প্রশ্ন আসছে।

-না, তার মধ্যে পাগলামির কোনো লক্ষণ আমি সেদিন দেখিনি। তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তার চাল-চলন কথাবার্তা স্বাভাবিক। আমাদের ডাক্তারি শাস্ত্রে স্বপ্নচারিতা বলে একটা রোগের কথা উল্লেখ আছে। যে লোক এই রোগের কবলে পড়ে সে ঘুমন্ত অবস্থায় যে কাজ করে, তার চেতন মনের সমর্থনে সে সেটা করে থাকে। কাস্ট এর ব্যতিক্রম নয়। সে যে চারটে খুন এ পর্যন্ত করেছে, তার প্রত্যেকটিতে তার চেতন মনের সায় সম্পূর্ণভাবে রয়েছে।

প্রতিটি খুন করার আগে সে পোয়ারোকে চিঠি দিয়ে জানান দিয়েছে। তার মানে খুনটা সেছে পরিকল্পনামতো। আগে থেকেই ভেবে নিচ্ছে। ধরা যেতে পারে শহরে এত লোক থাকতে বেছে বেছে আপনাকে কেন আক্রমণ করছে? সেটা হলো, আসলে আপনার নামের বিরুদ্ধে তার অভিযোগ, তার আক্রমণ। আপনাকে নিয়ে ওর যত না ভাবনা, তার থেকে বেশি মাথা ব্যথা ছিল এরকুল পোয়ারো নামটাকে নিয়ে। মনোবিজ্ঞানে এই রোগকে বলা হয় মনোবিকল। যারা সমাজে প্রতিষ্ঠিত, নাম-যশ আছে, তাদের হিংসা করা। লোকের সামনে তাকে ছোটো করে তুলে ধরা...লক্ষ্য করুন, ওর নামের প্রথম দুটো অংশ দুই শ্রেষ্ঠ পুরুষের নামের অংশবিশেষ। শিশু বয়সে ওর ঐ নাম রাখা হয়েছিল। আশা করা হয়েছিলো, বড় হয়ে নামকরা প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি হবে। কিন্তু সেটা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। ফলে তার মনে একটা ক্ষোভ বাসা বাঁধলো। বিতৃষ্ণা জাগলো স্বনামধন্য ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে। কিন্তু টমসন, থানায় ভালোমানুষের মতো নিজে আসার কারণটা কি?

-ওটা সাধারণত হয়ে থাকে। অপরাধী মনের চিরন্তন মনস্তত্ত্ব। যাকে বলে বিবেক। পাপ যখন কানায় কানায় ভরে যায় তখন বিবেকের দংশনে নিজেই পাগল হয়ে যায়। অপরাধ স্বীকারের জন্য মন তখন ছটফট করে ওঠে। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

এইভাবে কিছুক্ষণ আলোচনা চললো। টমসনের অন্য কাজ পড়ে আছে। তাই সে সেখান থেকে চলে গেল।

আমাকে একা পেয়ে জ্যাপ বললো–আপনার আর মিঃ পোয়ারোর সঙ্গে এ.বি.সি.-র মামলার ব্যাপারে কিছু আলোচনা করতে এলাম, দায়রা কোর্টে ইতিমধ্যে একটা জট পাকিয়ে উঠেছে। এটার জন্য দায়ী ঐ উঠতি বয়সের ব্যারিস্টার লুকাস। কাউকে কিছু না জানিয়ে সে হট করে মস্ত বড় একটা দরখাস্ত জর্জ সাহেবের এজলাসে জমা দিয়েছে আসামী পক্ষের হয়ে সে কথা বলতে চায় এটাই তার ইচ্ছা।

-তাতে ক্ষতি কি?

-ক্ষতি আছে। সে নাকি কাস্টকে খালাস করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। ইতিমধ্যে ব্যবস্থা নাকি পাকা করে ফেলেছে। বেক্সহিল খুনের রাতে কাস্ট নাকি ঘটনাস্থলের ধারেকাছেই ছিল না, এমন প্রমাণ তার কাছে আছে। সেদিন ঐ লোকটা নাকি স্ট্রেঞ্জ নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে সন্ধ্যা ছটা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত দাবা খেলে কাটিয়েছিল ইস্টবোনের হোয়াইট ক্রম হোটেলের বৈঠকখানায় বসে। কাগজে কাস্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রকাশিত হতে স্ট্রেঞ্জ নিজে থেকে এসে ঐ উকিলের সঙ্গে দেখা করে এবং সমস্ত ঘটনার কথা বলে। ফলে উকিলটি আনন্দে একটা মস্ত বড় দরখাস্ত নিয়ে বসে আছে।

-তুমি কি ঐ ভদ্রলোককে কখনো দেখেছো? ঐ যে কি নাম? স্ট্রেঞ্জ।

-হ্যাঁ, লুকাসের কাছ থেকে ওর ঠিকানা আমি সংগ্রহ করেছিলাম। সেইমতো ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করি। আমাকেও ঐ একই কথা সে বললো। ওরা নাকি খেলায় এত মত্ত ছিল যে রাত বেড়ে গেছে খেয়াল নেই। হোটেলের বেয়ারা আলো নেভাতে এলে ওদের হুশ

হয়। ফলে খেলায় ইতি টেনে যে যার কামরায় চলে যায়। হোটেলে রেজিস্টার দেখলাম। সেখানে কাস্টের হাতের লেখা নিজের সই রয়েছে। হোটেলের বেয়ারাকে জিজ্ঞাসা করলাম। সে-ও একই কথার পুনরাবৃত্তি করলো। এবার তাহলে বুঝতে পারছেন ঘটনাটা কোথায় গড়াতে চলেছে। তাই এ্যান্ডোভার, কাস্টন আর ডকাস্টারের খুনের অভিযোগগুলি যদি একসঙ্গে ওর ওপরে চাপিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে বেহিলের ব্যাপারটা আর আমল পাবে না। তবে বেহিলের ঘটনার মৃতদেহ পরীক্ষা করে জানা গেছে খুনটা হয়েছে রাত বারোটা থেকে রাত একটার মধ্যে। যদি ভদ্রলোকের কথা ধরে নেওয়া যায়, তাহলে ইস্টবোর্ন থেকে বেহিল চৌদ্দ মাইল রাস্তা। যদি সে বারোটা নাগাদ হোটেল থেকে বেরোয় তাহলে অত রাতে গাড়ি পাওয়া সম্ভব নয়। তাহলে টাঙ্গা ধরতে হয়। সময় লাগবে দেড় ঘণ্টা, খুব কম করেও। আর পায়ে হেঁটে যেতে পাঁচ ঘণ্টা খরচ করতে হবে। ঐ সময়ের মধ্যে বেক্সহিলে পৌঁছানো সম্ভব নয়।

–এই অবস্থায় তুমি কি করতে চাও?

–আমি কি করবো? যা করার মিঃ পোয়ারো করবেন। সে কিভাবে খুন করেছে সেটাই সর্বপ্রথম জ্ঞাতব্য বিষয়। আচ্ছা, স্যার এখন চলি। জরুরী মিটিং আছে। সবাই আপনার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, স্যার। আসি।

পোয়ারো আমাকে লক্ষ্য করে বললো–হেস্টিংস, তোমার কি ধারণা? এ.বি.সি. মামলা শেষ পর্যন্ত কি নিষ্পত্তি হতে চলেছে?

-সেরকমই, কারণ সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে যা জানা গেছে আর লোকটার সম্পর্কেও তো কিছু তথ্য জানা গেছে। তাছাড়া তুমি, ক্রোম, জ্যাপ আছো...সবাই আছো, বাধা কোথায়?

-তোমরা কিন্তু একটা ব্যাপারে মোটেও গুরুত্ব দিচ্ছে না। এ.বি.সি. রহস্যের প্রধান এবং প্রথম কথা সেখানেই সেই বশংবদ বন্ধুটির কথা একবারও জানার চেষ্টা করলে না।...সে কবে জন্মেছে..বংশ পরিচয়, চাকরি থেকে কবে বরখাস্ত হয়েছে...কতদিন ধরে মিসেস মার্থারির ভাড়াটে হিসাবে ছিল, এগুলো জানলেই সব জানা হয় না। আমাদের জানতে হবে, কেন সে নরঘাতক হয়ে উঠেছে। কুশলী হওয়া সত্ত্বেও কেন সে তার পাপের মাত্রা বাড়িয়ে গেছে। কেন সে নিজেকে অপরাধী বলে মনে করে, সব দোষ নিজের ঘাড়ে নিয়ে নেয়। ইত্যাদি এই ধরনের নানা প্রশ্ন। এইসব প্রশ্নের উত্তর তোমার জানা আছে? কেন সে বেছে বেছে এই লোকগুলোকে খুন করলো? ..হেস্টিংস, আমি আর একটা আলোচনা করতে চাই সকলের সঙ্গে বসে। তারপর যাবো আমার সেই বন্ধুটির কাছে। আমি তার মুখোমুখি হবো। নিভৃতে বসে আমি তার সঙ্গে কথা বলবো। তাকে আমি নতুন করে চিনবো, আমার প্রশ্নের উত্তরে কাস্ট কি বলবে, তুমি তা জানো না। আমি জানি সে নির্ভেজাল মিথ্যে কথা বলবে। সেটাই হবে আমার সত্যের উন্মোচন। মিথ্যের অন্তরাল থেকে বেরিয়ে আসবে এক নির্দয় নিষ্করুণ মহাসত্য।

এরপর প্রায় সাত-আটদিন পোয়ারোর সঙ্গে কোনো কথা হলো না। সে নিজের কাজে এত মগ্ন যে নাওয়া-খাওয়ার কথা পর্যন্ত ভুলে গেল। আর ধ্যান ভঙ্গ হতে সে আমাকে বললো, তার ইচ্ছে বেক্সহিল আর তার আশেপাশের অঞ্চলে সে আর একবার যেতে যায়। আমিও ইচ্ছে করলে তার সঙ্গে যেতে পারি।

অতএব পরদিন সকালে আমরা দুজনে বেহিলের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছতে দেখি আমাদের দলের অনেকে সেখানে হাজির হয়েছে। সকলেই আলাদা আলাদা ভাবে পোয়ারোর সঙ্গী হবে বলে জানিয়েছিল। পোয়ারো কারো মনে ব্যথা দিতে চায়নি। তাই সকলে এসে জমা হয়েছে।

আমরা সকলে একজোট হয়ে বার্নাড়দের বাড়ি গেলাম। মিসেস বার্নাডের সঙ্গে তার নিহত মেয়ের সম্পর্কে আর একবার আলোচনা হলো।

এরপর আমরা গেলাম ইস্টবোর্নে। হোয়াইট ক্রস হোটেলের ম্যানেজারের সঙ্গে কাস্টের ব্যাপারে বেশ কিছুক্ষণ কথা হলো। হোটেলের বেয়ারাও বাদ পড়লো না এই জেরার হাত থেকে। এবার আমরা এলাম ঘটনাস্থলে। যেখানে বেটির মৃতদেহ আবিষ্কার হয়েছিল। সমুদ্রের বালিয়াড়িতে কয়েকপাক ঘুরঘুর করে আমরা গাড়ির দিকে রওনা হলাম।

আমরাও নির্বাক পোয়ারোর পেছনে পেছনে ঘুরছি। এরকম হয়রানি করার কি মানে, সেটা জিজ্ঞেস করার সুযোগ পাওয়ার আগে সে গিয়ে ঢুকলো জিঞ্জার ক্যাটে। সেখানে লিলি হিগলির সঙ্গে কথাবার্তা সেরে সে তার রসিকতা করতে বসলো। যেমন তার পায়ের সৌন্দর্য নিয়ে কত প্রশংসা করলো। মুহূর্তের মধ্যে তার ঠাট্টা-তামাশা ভরা মুখখানা গম্ভীর হয়ে উঠলো।

আমাদের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর স্বরে বললো–আমি একবার ইস্টবোর্নে যাবো। একাই যাবো। কাজ সেরে ফিরে আসতে প্রায় ঘন্টা দুয়েক সময় লাগবে। আপনারা সবাই

এখানে বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে হোয়াইট ক্রসে চলে যাবেন। সেখানে আমার জন্য অপেক্ষা করবেন।

আমরা যখন হোয়াইট ক্রস হোটেলে ফিরে এলাম তখন বেলা দুটো বাজে। টেবিলের চারধারে বসলাম। বৈঠক শুরু হলো।

নীরবতা ভঙ্গ করে কথা বলে উঠলো ফ্রাঙ্কলিন–আচ্ছা, সকাল থেকে যে চক্কর মারা হলো, তাতে কি কোনো কাজ হলো?

-না সব বিফলে গেল। এখন আমাদের ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হবে। চুপ করে কেবল অপেক্ষা করতে হবে। এখন ওসব কথা বাদ দিন। আসুন, একটা খেলা খেলি।

-খেলা! আমরা সবাই অবাক হয়ে পোয়াটের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

-হা, ছোটোবেলায় অনেকে মিলে আমরা এই খেলাটা খেলতাম। দলে একজন নেতা থাকতো। গোল হয়ে সকলে বসতাম। দলনেতা প্রত্যেকটি ছেলেকে বিভিন্নভাবে তিনটি করে প্রশ্ন করতো। এই খেলায় নিয়ম ছিল, তিনটে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকলেও জবাব দেওয়া চলবে না। প্রথম দুটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে হত, কিন্তু শেষের প্রশ্নের জবাব ইচ্ছা না থাকলেও ভুল বলতে হত। যদি-বা কেউ মনে না থাকার দরুন সঠিক জবাব দিতো তাহলে সে ফল হিসাবে পেত এতবড় এক গোল্লা। অনেকক্ষণ ধরে এই খেলা চলতো। তারপর প্রত্যেক খেলোয়াড়ের নাম যোগ-বিয়োগ করে দেখা হত। সে সবচেয়ে বেশি নম্বর পেতে তাকে জয়ী বলে ঘোষণা করা হত। এই খেলার নাম কি জানেন?

মহাসত্য। তবে আর একটা মজা ছিল। খেলায় যোগ দেওয়ার আগে খেলোয়াড়কে ঈশ্বরের নামে শপথ করতে হত, বিশ্বাস ভঙ্গ করবে না কেউ।

শুরু হলো খেলা। খেলার উদ্বোধন করলো মেগান। সে শপথ করলো, সময় কম, তাই পোয়ারো বললো-এখানে তিনটে প্রশ্ন হবে না। হবে একটা প্রশ্ন। সকলকে ঐ একটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে হবে। এ ব্যাপারে কারো কোনো মন্তব্য থাকলে এ সময়ে বলতে পারেন।

সবাই ঘাড় নেড়ে জানালো, তাদের কারো কিছু বলার নেই।

-তাহলে আমার ইচ্ছা, পোয়ারো বললো, খেলাটা কোনো ছেলেকে দিয়েই শুরু করা হোক। প্রথমে জবাব দেবে ফ্রাঙ্কলিন। পোয়ারো প্রশ্ন করলো–ফ্রাঙ্কলিন, আপনি বলুন, অ্যাসকটের শীতপ্রধান অঞ্চলের মেয়েরা যে ধরনের টুপি পরে আপনি কি দেখেছেন?

–আসলে অ্যাসকটে তো কোনোদিন যাইনি।..তবে শহরের আশেপাশে যে সব মেয়েদের নজরে পড়েছে, তাদের টুপির চেহারা দেখেছি। বলা যায় প্রশংসনীয়, যেন একটা বুড়ি মাথার ওপর উল্টে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঝুড়িটা কপালের ওপর দিয়ে নাক পর্যন্ত নেমে এসেছে। আচমকা নজরে পড়লে মনে হয়, যেন একটা মস্ত টুপি অলস ভঙ্গীতে রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছে।

-এবার মঁসিয়ে ফ্রেসার বলুন, এ বছরের ঠিক কোন সময় আপনি অফিসে ছুটি নিয়েছিলেন?

–আগস্ট মাসের পয়লা থেকে পনেরো তারিখ পর্যন্ত পনেরো দিনের ছুটি নিয়েছিলাম।

এবার থরার দিকে তাকিয়ে পোয়ারো বললো, আচ্ছা মাদমোয়াজেল, স্যার কারমাইকেলের জীবিত অবস্থায় যদি লেডি ক্লার্ক মারা যেতেন তাহলে আপনি তাকে বিয়ে... ।

-থামুন...আর একটা কথাও বলবেন না। উনি ছিলেন আমার কাছে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। দেবতার মতো। ঐরকম ভদ্র, সজ্জন লোকের সম্পর্কে আপনি এ ধরনের কথা বলতে পারেন না। আপনাকে আগেই জানিয়েছি, উনি আমাকে তার মেয়ের মতো স্নেহ করতেন।

মাদমোয়াজেল বার্নার্ড, মেগানকে প্রশ্ন করলো পোয়ারো, আপনি কি আপনার বোনের হত্যা রহস্যের নিগুঢ় সত্যটি জানতে চান না?

মেগান ইচ্ছার বিরুদ্ধে জবাব দিলো, না, আমি জানতে আগ্রহী নই।

ওর জবাব শুনে ঘরের সকলে হতভম্ব হয়ে গেল।

তারপর মেরির দিকে তাকিয়ে পোয়ারো জিজ্ঞেস করলো, তোমার মন দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারে এতদিনে কি কিছু ঠিক করে উঠতে পারলে?

সে দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে উত্তর দিলো, না, পারিনি।

পোয়ারো চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

–আমাকে বিশেষ কাজে এখুনি বেরোতে হচ্ছে। কে কত নম্বর পেলো, সেটা পরে জানাবো। ভাবছি, আর একবার বেক্সহিলে টহল দিয়ে বাড়ি ফিরবো। আপনারা যে এতক্ষণ বসে আমাকে সহযোগিতা করলেন সেজন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। হেস্টিংস, দেরি কোরো না চলো।

দ্রুত পায়ে পোয়ারোর পিছু পিছু রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম।

প্রশ্ন করলাম–পোয়ারো এই নিয়ে তিনবার তুমি বেক্সহিলে গেলে। কি ব্যাপার বলো তো?

-উঁহু...। দুবার।

–দুবার ঘুরে এসেছে, আবার যাচ্ছে। তাহলে তিনবার হলো না।

-না, এখন বেক্সহিলে যাচ্ছি না। ওখানে আর কাজ নেই। আসলে ওদের কাছ থেকে ঐ অছিলায় বেরিয়ে এলাম। নাও, আর কথা না বাড়িয়ে এগোও। কাস্টের সঙ্গে আলোচনাটা এই বেলা সেরে ফেলতে হবে। তারপর বাকি কাজগুলো সম্পূর্ণ করে পরে তোমার প্রশ্নের জবাব দেবো।

আমাকে অপেক্ষা করতে বলে পোয়ারো চলে গেল কাস্টের সঙ্গে দেখা করতে। ওদের মধ্যে কি কথা হয়েছিল এটা শোনার সৌভাগ্য আমার হয়নি। অবশ্য পোয়ারো ইচ্ছে করলে, তার প্রিয় বন্ধু হেস্টিংসকে সঙ্গে নিতে পারতো। কিন্তু তা করলো না–

কিছুক্ষণ পরে পোয়ারো ফিরে এলো। আলেকজান্ডার বোনাপার্ট কাস্টের সঙ্গে পোয়ারোর কি কথাবার্তা হয়েছে সব কিছু নিখুঁতভাবে আমাকে জানালো, সাক্ষাৎকারের সমস্ত ঘটনা যেন আমার সামনে জীবন্ত হয়ে উঠলো। আমার মনে আর কোনো দুঃখ রইল না।

কয়েকদিনেই কাস্টের চেহারা ভীষণ ভেঙে পড়েছে। বললাম, কি আমাকে চিনতে পারছেন?

কাস্ট আমার দিকে ভালো করে তাকিয়ে বললো–না। আমি আমার নিজের পরিচয় দিয়ে বললাম, আপনিই তো আমাকে পরপর চারখানা চিঠি পাঠিয়েছিলেন। তখন তিনি আমাকে গোয়েন্দা হিসাবে চিনতে পারলেন ঠিকই কিন্তু সেটা প্রকাশ না করে বললেন, আপনাকে আমি কখনো কোনো চিঠি লিখিনি।

–তাহলে কে কিঠিগুলো পাঠালো?

হবে আমার কোনো শত্রু। আমাকে বিপদে ফেলতে চায়, আমাকে হেনস্তা করা তার ইচ্ছা। আমার দুঃখকষ্ট দেখে আনন্দ পাবে বলে একাজ করেছে।...জানেন, আমার বিরুদ্ধে সবাই ষড়যন্ত্র করে, আমাকে ভালো নজরে কেউ দেখে না। তাই পুলিশ কোর্টের কেউ আমায় পছন্দ করে না। আমি যেন ওদের কাছে বিষ।..কিন্তু আমার জীবনের গোড়ার দিকে, যখন আমার মা বেঁচেছিল, তখন মায়ের স্নেহ-মমতায়, আদর-যত্নে, ভালোবাসায় আমার মন কানায় কানায় পূর্ণ ছিল।

আমিও আমার ভালোবাসা শ্রদ্ধা তাকে উজাড় করে দিতাম। আমাকে নিয়ে তার মনে অনেক স্বপ্ন ছিলো। বলতো, আমার একটি আঙুলের ইঙ্গিতে পৃথিবী অচল হয়ে যাবে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বলতে লাগলেন মিঃ পোয়ারো, আমার মায়ের কোনো সাধ আমি পূর্ণ করতে পারিনি। তাই বুকভরা হতাশা নিয়ে একদিন তার কাছ থেকে চলে এলাম। পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ মানুষের বাস, তারা যে যার ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বপ্ন দেখে, কিন্তু কেউ তোয়াক্কা করে না। কেউ সেই স্বপ্ন পূর্ণ করতে পারে না।...আমাকেই দেখুন না, আমার মায়ের স্বপ্ন কি আমি সার্থক করতে পেরেছি...পারিনি। সেই স্কুল জীবন থেকে শুরু করে চাকরি জীবন পর্যন্ত কোনো ক্ষেত্রেই নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারিনি। জানেন, সবাই আমাকে মূর্খ বলতো। পরিচিত গণ্ডীর মধ্যে নিজকে সযত্নে আড়াল করে সেই অন্ধ অহঙ্কারের তাড়নায় সারাটা জীবন বোকার মতোই কেবল ছুটেই মরলাম।.অপদার্থ অপবাদ জীবনে ঘোচাতে পারলাম না।

-আপনি যখন যুদ্ধে গেলেন?

-হ্যাঁ, যুদ্ধ। সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। আমাদের তখন একটাই পরিচয়, আমরা সৈন্য। জাত–পাত, মূর্খ-জ্ঞানীর কোনো আলাদা পরিচয় নেই। শত্রু সৈন্যদের সামনে দাঁড়িয়ে আমরা কি অসহায়!...আমি সেখানে পেলাম বুকভরা আনন্দ।..তারপর সেই গুলি মাথার পেছনে ঢুকে গেলো।..ভয়ঙ্কর জখম। আরো নানারকম রোগে আক্রান্ত হয়ে ওখান থেকে বিদায় নিলাম।... থেকে থেকে মাথার অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করতাম।...কি করতাম, না করতাম, কিছু মনে থাকতো না।...অবশেষে মোজা বিক্রি শুরু করলাম। শরীর না চললেও পেট তো মানবে না। তাই ঘুরে ঘুরে মোজা ফেরি করি।

-কোনো কোম্পানি নাকি আপনার নাম কখনও শোনেনি?

–এই কথা বলেছে? সব ব্যাটা শয়তান। সবুর করুন। আমিও মজা দেখিয়ে দেবো। যেদিন কোর্টে মামলা উঠবে, তাদের ছাপানো প্যাডে আমার নাম লেখা চিঠির বোঝা ম্যাজিস্ট্রেটের নাকের ডগায় ছুঁড়ে দেবো। তখন দেখবো ব্যাটারা কিভাবে অস্বীকার করে।

বললাম, চিঠি?

-হ্যাঁ, চাকরিতে যোগ দিতে অনুরোধ করে চিঠি দিয়ে কোন শহরে যেতে হবে, সেসব নির্দেশ দেওয়া চিঠি–সবাইকে দেখিয়ে দেবো। টের পাবে সবাই।

-না, হাতে লেখা হবে কেন? বড় কোম্পানি, সব টাইপ করা চিঠি। তাদের তো টাইপ মেশিনের অভাব নেই।

-আপনার ঘর তল্লাশি করে একটা টাইপ মেশিন পাওয়া গেছে। আমি ইতস্তত করে বললাম।

হতে পারে। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কাজের সুবিধার জন্য কোম্পানি মেশিনটা আমাকে ব্যবহার করতে দিয়েছিল। আমি আলমারিতে সেটা রেখে দিয়েছিলাম।

–কিন্তু আমি যদি বলি, আমাকে যে চিঠিগুলো পাঠানো হয়েছিল সেগুলো ঐ টাইপ মেশিনে টাইপ করা হয়েছিল। আপনি কি সেটা উড়িয়ে দেবেন?

অবশ্যই। আমি যেটা করিনি সেই দোষ নিজের ঘাড়ে নেবো কেন? তাছাড়া আপনি কি করে জানলেন, চিঠিগুলো ঐ মেশিনে টাইপ করা হয়েছিল।

–না, অন্য মেশিনে নয়। তাছাড়া আপনার ঘর থেকে বেশ কয়েকখানা এ.বি.সি গাইড পাওয়া গেছে।

–আসল ব্যাপারটা কি জানেন, ওগুলো যে এ.বি.সি, গাইড সেটা আমি নিজেই জানতাম না। পিওন পার্শেলটা দিতে এসেছিল। ভাবলাম, কোনো কোম্পানি হয়তো মোজা পাঠিয়েছে। খুলে তো অবাক। ফেলে না দিয়ে সেগুলো আলমারিতে রেখে দিলাম।

আর ঐ যে টেবিলের ড্রয়ারে রাখা নামের তালিকা। এক-একটি নামের পাশে পেন্সিল দিয়ে মার্ক করা হয়েছে, এর মানে কি?

এটা তো সোজা ব্যাপার। যেসব বাড়িতে ঘুরেছি, সেগুলো পেন্সিল দিয়ে দাগ কেটে রেখেছি।

–আপনার কথা আমি মানতে পারলাম না। যদি বলি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে দাগগুলো দিয়েছেন, এক-একটা খুনের পর

না, এসব সাজানো, সব মিথ্যে। আমাকে ফ্যাসাদে ফেলার জন্য এ এক চক্রান্ত। আমি সেদিন রাত সাড়ে বারোটা পর্যন্ত ইস্টবোর্নের হোয়াইট ক্রমের বৈঠকখানায় বসে দাবা খেলেছি। ...সেদিনর রেজিস্টারে আমার নাম সই করা আছে, তাছাড়া চব্বিশ তারিখ স্পষ্ট করে লেখা আছে।

-আপনি সেদিন দাবা খেলতে বসেছিলেন কেন? অন্য খেলাও তো খেলতে পারতেন। দাবা আপনি ভালো খেলেন বুঝি?

ভালো-মন্দ জানি না। তবে খেলতে বসলে কোনো হুঁশ থাকে না। পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকে মন সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এমনই নেশা। সেদিনের একটা ঘটনার কথা বলি, সেটা ছিল দ্বিতীয় বাজি। চুপচাপ খেলছি। তার আগের বাজিতে আমি জিতেছি। দ্বিতীয় বাজিতে স্ট্রেঞ্চকে প্রায় ঘায়েল করে এনেছি, এমন সময় দর্শকদের মধ্যে একজন আমার হাত টেনে নিয়ে দেখতে শুরু করলো। আমার সম্বন্ধে কয়েকটা প্রশ্ন করলো, কি চাকরি করি, কত আয় ইত্যাদি। শেষে বললো, মরার আগে আমার নাম পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়বে। এক ডাকে সকলে আমাকে চিনবে। আরো বললো, ফাঁসিতেই নাকি আমার মৃত্যু।

কি এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় তার মুখ কুঁকড়ে উঠলো। ঠোঁট দুটো কেঁপে কেঁপে উঠলো–কি যন্ত্রণা...এক বিরাট শূন্যতা।

আমি সুযোগ বুঝে প্রশ্ন করলাম, কিন্তু আপনি কি অস্বীকার করতে পারেন, আপনি খুন করেন নি? কেন করেছেন? আপনার কি উদ্দেশ্য

মুখ বিকৃত করে বললো–জানি না, আমি খুন করিনি। কেন খুন করেছি, সেটাও আমার অজানা।

কাস্টের সঙ্গে পোয়ারোর কথোপকথন আমরা সকলে মন দিয়ে শুনলাম। এবার পোয়ারো আমাদের ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেবে, কিভাবে সঠিক সমাধানে সে উপনীত হলো।

বিবৃতি শুরু করলো পোয়ারো–যেদিন থেকে রহস্যের সৃষ্টি হয়েছে সেদিন থেকে অর্থাৎ গত কয়েক মাস ধরে আমি কেবল মনের মধ্যে একটি খোঁচা অনুভব করতাম, কেন এই খুন?... তাছাড়া খুনীর আসল পরিচয় কি, সেটাও আর একটি বড় প্রশ্ন। আপনারা হয়তো বলবেন, লোকটি উন্মাদ, অপ্রকৃতিস্থ, কার্যকারণ সম্পর্কে মাথা ঘামাবার মতো শক্তি তার নেই। কিন্তু আমি বলবো, ঠিক এর উল্টো। একজন সুস্থ মানুষ যতখানি যুক্তিবাদী হয়ে থাকে। একজন পাগলও ভেতরে ভেতরে ততখানি হয়। আমাদের তার দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখতে হবে। তবেই আমরা সেই যুক্তির তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারব। নতুবা প্রতিটি কাজ আমাদের সৃষ্টিছাড়া...আমাদের অপরাধীটি এক বিচিত্র মানসিকতা সম্পন্ন মানুষ। একদিকে যেমন যুক্তিবাদী তেমনি যুক্তিহীন, নিয়মমাফিক এবং নিয়মছাড়া। পরম বিবেচকের মতো সে যেমন প্রতিটি খুনের আগে চিঠি দিয়ে এরকুল পোয়ারোকে সতর্ক করেছে। তেমনি নিজের খেয়ালে একটা একটা করে চারটে খুন করতে পেরেছে।...আসলে লোকটির মনে দ্বি-মানসিকতা বাসা বেঁধে আছে। রহস্যের সমাধানে এটাই জটিলতা সৃষ্টি করেছে। আমি বিশ্বাস করতে পারছি না, একই মানুষের মধ্যে এত বিরোধিতা থাকতে পারে। তাই প্রথম চিঠি পেয়ে আমি বুঝতে পেরেছিলাম এর মধ্যে কোনো গোলমাল আছে...। কিন্তু মিসেস এ্যাস্বার-এরপর থেকে যে খুনগুলো হলো সেখানে আমি মাথা ঘামালাম না যে কে খুনী। তার স্বরূপ কি, খুনের অন্তরালে তার মোটিভই-বা কি?..কিন্তু ধীরে ধীরে আমার হাতে কিছু কিছু সূত্র এসে পড়তে লাগলো।

শুধু নিজের নাম জাহির করা যে খুনীর উদ্দেশ্য তা মোটেও নয়। তাহলে সংবাদপত্র অফিস বসে থাকতো না। এরকম কয়েকটা চিঠি পেলে তারা নিশ্চয়ই ছাপাতো। কিন্তু দ্বিতীয় চিঠিটা পাওয়ার পর অর্থাৎ মিস বার্নার্ডের মৃত্যু রহস্য আমাদের এক নতুন তথ্যের সন্ধান দিলো। অবশ্য কিছু করতে পারিনি আমরা। কিন্তু আবিষ্কার করলাম বর্ণমালার

অক্ষর ধরে একের পর এক খুন অনুষ্ঠিত হবে। ততদিনে নতুন আর একটি প্রশ্ন উদয় হলো–কেন এ.বি.সি. এমন নারকীয় হত্যা চালিয়ে যাচ্ছে? সে কি কেবল খুন করার তাগিদেই এমন বীভৎস কাণ্ড ঘটিয়ে যাচ্ছে? প্রশ্নে প্রশ্নে আমার মন জর্জরিত হয়ে উঠলো। কে যেন আমাকে বার বার বললো, পোয়ারো খুনীকে জানার চেষ্টা করো। কেন শুধু শুধু তার রহস্যের টানাপোড়েনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছো? কেবল একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, খুনী তার ক্ষমতার মধ্যে যতটুকু করতে পারে তাতেই সে সন্তুষ্ট, সে খুশী।...এ.বি.সি. গাইড আমরা প্রত্যেকটা খুনের জায়গায় পেয়েছি। তাতে ভাবলাম, খুনীর হয়তো ভ্রমণের নেশা আছে। আর একটা করে গাইড নিহত ব্যক্তির পাশে ফেলে আসা হয়তো তার মনোবিকারের একটা পর্যায়। বেটির মৃত্যুর বর্ণনা আমি মেগানের কাছ থেকে পাবার পর মনে মনে একটা ছবি এঁকে ফেলেছি। এ.বি.সি. এবং বেটি–দুজনে পাশাপাশি বসে আছে। সামনে নীলসমুদ্র। বালিয়াড়ির উপর জলরাশি উপরে পড়ছে। রাতের আকাশ মাথার ওপরে, নক্ষত্র জ্বলজ্বল করছে। রাতের সৌন্দর্য দেখতে দেখতে দুজনেই আনমনা হয়ে উঠেছে। এ.বি.সি.-র ওপর বেটি তার শরীর হেলিয়ে দিয়েছে। বেটির চুল নিয়ে আদর করছে এ.বি.সি.। কি একান্ত সেই ক্ষণ? বেটি আদরে আদরে জর্জরিত, ভালোবাসায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে তার দুটি চোখ। এ.বি.সি.-র হাত ততক্ষণে চলে এসেছে আরো নিচে। তার আঙুল খেলা করে বেড়াচ্ছে বেটির মুখে, নামে, গলায়। খেলতে খেলতে খেলার ছলে সেই আদরভরা হাতখানাই খুলে নিলো তার কোমরের বেল্ট। হাতের মালিক বেটিকে বললো, যদি এই মুহূর্তে তোমাকে খুন করি। বেটি নীরব। চোখ বন্ধ। বেল্টটা জড়িয়ে ধরলো বেটির গলা। বেটি শান্তভাবে বললো, খুন করবে? করো না। আর অপেক্ষা না করে এ.বি.সি. একটু একটু করে টেনে দিলো বেটির গলার বেল্ট।

...এবার স্যার কারমাইকেলের প্রসঙ্গে আসছি। ভারী কোনো অস্ত্র দিয়ে তার মাথা থেতলে দেওয়া হয়েছিল। জেরা-টেরার পর একটা নতুন প্রশ্ন সংযোজিত হলো–বর্ণমালার নিয়ম মেনে খুনী ঠিক এ.বি.সি. করে এগোচ্ছে, তখন সি.-র ঘরে একশো তিপান্ন অথবা পঞ্চান্ন অথবা সাতান্ন নম্বরে থাকা কাস্টন। অতএব আমি প্রায় পনেরো মিনিট ধরে নাজেহাল হয়ে গাইড বুক ঘাঁটলাম। কিন্তু খোঁজাই সার। নম্বরের ব্যাপারে মিলের নাম গন্ধও নেই। এই তফাত কেন? নিয়মনিষ্ঠ ব্যক্তির এমন অনিয়ম হওয়ার তো কথা নয়। তারপরেই এলো চতুর্থ চিঠি। এবারে খুনের জায়গা ডন্ কাস্টার। কিন্তু ভুল হলো একটা জায়গায়। বর্ণমালার চার নম্বর অক্ষরের খুন হওয়ার কথা। কিন্তু পাঁচ নম্বর অক্ষর সেই জায়গায় চলে এলো। অবশেষে বিবেকের দংশনে তাড়িত হয়ে হত্যাকারী স্বয়ং এসে ধরা দিলো। বাকি সমস্যা সমাধানের অবশিষ্ট রইলো আদালতের রায়। আমি কিন্তু এখনও খুশী নই। শুনে অবাক হচ্ছেন তাই তো? কারণ দুঃখ রয়ে গেল একটাই, কেন-র জবাব এখনও আমার অজানা রয়ে গেল। আর একটা ব্যাপার, বেহিলের খুনের ব্যাপারে আসামী যে মিথ্যে উত্তর খাড়া করেছে, সেটা আজও আমার কাছে অন্ধকারের মতো কালো হয়ে আছে।

...যদি ধরি চারটি খুনের মধ্যে তিনটি খুন করেছে কাস্ট। দুনম্বর খুনটা করেছে অন্য কেউ... যার সঙ্গে বেটি বার্নার্ড সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। কারণ কথা যে গুছিয়ে বলতে পারে না, এমন একটা লোকের পক্ষে রাত বারোটার পর প্রেম নিবেদনের অছিলায় বেটি বার্নার্ডকে নিয়ে গেছে সমুদ্রের ধারে...ভাবতেও আশ্চর্য লাগে। যদিও বা সে অন্য ব্যক্তি হয় তাহলে খুনটা বেশ নিয়ম মেনেই করেছে, কে সেটা জানতে হবে। অনেক ভাবনা চিন্তার পর আমি আমার দ্বিতীয় সিদ্ধান্তে হাজির হলাম, যে দ্বিতীয় খুনটি করেছে সে অন্য

কেউ এবং বেটি বার্নার্ডের মৃত্যুর জন্য সে দায়ী। আচ্ছা, এমন কি হতে পারে না, ঠিক তিনটে খুনের জন্য সেই লোকটাই দায়ী।

-না না, এ অসম্ভব। ফ্রাঙ্কলিন জোরালো প্রতিবাদ করে উঠলো, এটা কোনো যুক্তি নয়।

–এটাই যুক্তি। এরকুল পোয়ারোর কোনো সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক নয়। এই সিদ্ধান্তকে ভালো করে যাচাই করে নেওয়ার জন্য আমি চিঠি দুখানা আবার ভালো করে পড়লাম। চিঠি পড়ে বুঝলাম, চিঠির লেখক এ.বি.সি. সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক। পাগলও নয়, মাথা খারাপও নয়। আসলে সে আমাদের অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ানোর জন্য পাগলের ভান করছে। তাহলে এমন চিঠি লেখার উদ্দেশ্য কি তার? হঠাৎ মনে হলো, একাধিক খুন করে আমার বা আমাদের দৃষ্টি অন্য দিকে ঘোরাতে চেয়েছিল।...তাহলে এবার দেখা যাক, প্রথমে আলাদাভাবে, তারপর একই সঙ্গে চারটি খুনের জন্য মৃত বা মৃতার আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে কে সবচেয়ে বেশি সন্দেহজনক। যদি এ্যান্ডোভারের মিসেস এ্যাস্বারকে দিয়ে শুরু করি তাহলে সেখানে তার স্বামী...কিন্তু অন্য খুনের ব্যাপারে তাকে দোষারোপ করা যায় না। বেক্সহিলের ঘটনাতে বেটি বার্নার্ডের হত্যার জন্য দায়ী করা যায় মঁসিয়ে ফ্রেসারকে তাহলে বাকি খুনের ব্যাপারে হিসেব গরমিল হয়ে যায়।..আবার ধরা যাক, স্যার কারমাইকেলের খুন করা হয়েছে প্রচুর সম্পত্তির লোভে, উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য। এক্ষেত্রে যদি মঁসিয়ে ফ্রাঙ্কলিনকে খুনী ধরা হয় তাহলে হঠাৎ মনে হয়, এই ফ্রাঙ্কলিন ক্লার্ক এবং এ.বি.সি, এক ও অভিন্ন।

ফ্রাঙ্কলিন রেগে গিয়ে বলে উঠলো, কাস্ট নিশ্চয় তার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো স্বীকার করেনি?

-না, সে সব স্বীকার করে নিয়েছে। কিন্তু তার জবানবন্দী লক্ষ্য করে হিসেব করতে গিয়ে দেখি গরমিল হয়ে যাচ্ছে। তার সব কথা শুনে, তাকে দেখে আমার মনে হলো, সে আসল অপরাধী নয়। লোকে তাকে খুনী বলে অভিহিত করার চেষ্টা করছে।

...কিন্তু মঁসিয়ে ফ্রাঙ্কলিন, আপনার সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে গেল। কূলে এসে তরী ডুবলো। আপনি আপনার দাদার সম্পত্তির অধিকার পাওয়ার জন্য তাকে খুন করলেন। আপনি আমাকে একটা চিঠি দেখিয়েছিলেন, মনে আছে নিশ্চয়ই...যেটি আপনার দাদা আপনাকে লিখেছিলেন। সেই চিঠি পড়ে আপনার মনে আশঙ্কা জাগলো। মিস গ্রে-কে আপনার দাদা স্নেহ করতেন। যদি সেটা ধীরে ধীরে ভালোবাসায় পরিণত হয় এবং যদি দুজনে বিয়ে করে। ভবিষ্যতে তাদের সন্তান হবে। তাহলে সে-ই সন্তান হবে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। অতএব ভালো-মন্দ বিচার না করে আপনার দাদাকে আপনি খুন করবেন। আর এই একটি কারণকে উপলক্ষ্য করে আপনি বেপরোয়া হয়ে ওঠেন। কি করে সব বাস্তবায়িত করা যায় যখন ভাবছেন তখন একদিন কাস্টের সঙ্গে আপনার দেখা হয়ে গেল। ভাগ্য আপনার সুপ্রসন্ন ছিল।

...তার মাথা যন্ত্রণা, শারীরিক অসুস্থতা, এ.বি.সি. বর্ণানুক্রমিক খুনের পরিকল্পনা সব মিলিয়ে আপনি হিসেব করে দেখলেন কাস্ট এবং আপনার দাদার আদ্যাক্ষর সি। তারপরেই আপনি রণক্ষেত্রে নেমে পড়লেন। শহরের নামকরা কোম্পানির নামে প্যাড ছাপালেন যেগুলো ভুয়ো। ভুয়ো নিয়োগপত্র পাঠালেন কাস্টের কাছে। যেখানে আপনি মোটা মাইনে এবং কমিশনের টোপ দিয়েছেন। কোনো এজেন্টের কাছ থেকে সস্তায় কিনে নিয়ে এলেন মোজা এবং সেই মোজা নিজের খরচায় পার্শেল করে পাঠিয়ে দিলেন

কাস্টের কাছে। সেই সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকে এ.বি.সি. গাইড পাঠাতে ভুললেন না। প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ এখানেই শেষ। এবার আপনার কাজ হলো শিকার খুঁজে বেড়ানো। একদিন মিসেস এ্যাস্বারের দোকানের সাইন বোর্ডে স্বত্বাধিকারীর নাম এবং ঘটনাস্থলের খুঁটিনাটি সব জেনে ফিরে এলেন বাড়িতে।...দ্বিতীয় শিকার বেটি বার্নার্ড, যে পুরুষ সঙ্গ পেতে পছন্দ করে। তার সঙ্গে পরিচয় হলো এবং ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠতা বাড়লো। প্রথম দুটি খুন করে আপনি যখন সম্পূর্ণ ফল লাভ করলেন তখন বাকিটুকু করার জন্য আদাজল খেয়ে লেগে পড়লেন। এ্যান্ডোভারের কয়েকটি বাড়ির পরিবারের নামের একটা তালিকা করে কাস্টকে পাঠালেন। কাস্টকে নির্দেশ দিলেন সে যেন তালিকা অনুযায়ী প্রত্যেকটি পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। এর উদ্দেশ্য হলো, খুনের দিন কাস্ট যে এ্যান্ডোভারে ছিল এটা তার প্রমাণ। একইভাবে আমাকে চিঠি দিয়ে খুনের তারিখ এবং জায়গা জানালেন। আপনি মিসেস এ্যাস্বারের দোকানে গিয়ে সিগারেট চাইতে সে পিছন ঘোরে। আপনি সময় নষ্ট না করে তাকে আঘাত করে বসলেন। এরপর বেক্সহিল, নির্দিষ্ট তারিখের একেবারে দিনের প্রারম্ভে সেখানে কাজটা হাসিল করলেন। সেটা চব্বিশ তারিখ হলেও কাগজে কলমে সেটা হবে পঁচিশ।

...এবার তৃতীয় খুন অর্থাৎ আপনার দাদার পালা। আপনি এক্ষেত্রে একটু চালাকির আশ্রয় নিলেন। চিঠিটা যাতে আমি দেরিতে পাই তার ব্যবস্থা করলেন।...আপনি আমাকে কেন চিঠি পাঠান? এর জবাব খুঁজতে খুঁজতে আবিষ্কার করলাম, দুটি কারণে আপনি আমাকে চিঠি পাঠান। প্রথমত, আমাকে এবং গোয়েন্দা দপ্তরকে এ.বি.সি. রহস্য সম্বন্ধে সচেতন করতে। দ্বিতীয়ত, আমার নামকে মূলধন করে তার এক অদ্ভুত মনোবাসনা পূরণ করতে...এখানে আপনি যদি আপনার পরিকল্পনামাফিক খুন না করেন তাহলে আপনাকে সন্দেহ করা যেতে পারে। তাই কায়দা করে আপনি ঠিকানা ভুল করে চিঠি

দেরি করে পাঠালেন। ততক্ষণে আপনি আপনার কর্ম সমাধা করে ফেলবেন। এই তিন নম্বর হত্যা সম্পূর্ণ করার পর আলোচনা থেকে আপনি বুঝতে পারলেন, সন্দেহের ঊর্ধ্বে আপনি আছেন। দেখলেন, পুলিশ আর বসে নেই। জোর কদমে কাজ শুরু করে দিয়েছে। আপনি তাই নিয়মের ব্যতিক্রম করে চার নম্বর অক্ষরের পরিবর্তে পাঁচ নম্বরকে বেছে নিলেন শিকার হিসেবে।

...এরপর আমরা সদলবলে ডন কাস্টারে গিয়ে হাজির হলাম। আপনিই এই পরামর্শ দিয়েছিলেন। এদিকে অপনার নির্দেশমতো কাস্টও সেখানে এসে হাজির। সে এখানে কোথায় থাকবে সেটা আপনার আগেই জানা ছিলো। সেদিন আপনার একটা উদ্দেশ্য ছিল যেভাবে হোক খুন করতেই হবে এবং কাস্টকে সেই খুনের জন্য দোষী সাব্যস্ত করতে হবে। কাস্ট সিনেমা হলে ঢুকতে আপনিও তার পেছন পেছন ঢুকে পড়লেন। ইচ্ছে করে মাথা থেকে টুপিটা ফেলে দিলেন এবং খোঁজার অছিলায় সামনের সারির দিকে ঝুঁকে পড়ে ছুরিটা ঢুকিয়ে দিলেন। ব্যাস, কাজ শেষ।

...কাগজে কাগজে খবরগুলো প্রকাশিত হলো। কাস্টের নজর এড়ালো না। সে মনে করেছিল যেহেতু তিনটি খুনের ক্ষেত্রে সে ঐসব ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল, তাই লোকে তাকে খুনী মনে করছে। অনেক সময় দেখা গেছে, দুর্বল মানুষ নিজের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে, তার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হলো না। এমন সময়ে তার কাছে চতুর্থ নির্দেশ এলো ড কাস্টারে যাওয়ার। সে কিছু বুঝতে না পেরে ইচ্ছাকৃতভাবে বেরোনোর সময় সে মিথ্যে কথা বললো মিসেস মার্থারিকে, যে সে বেলতেন হ্যাঁমে যাচ্ছে।

...তারপর ডন কাস্টারের কাজ শেষ করে সিনেমা হল থেকে ফিরে যখন নিজের জামার আস্তিনে রক্ত ও পকেটে ছুরি দেখে তখন তার সমস্ত চিন্তাভাবনা সত্য বলে মনে হলো। তখন তার কেবল একটাই কথা মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগলো, আগের তিনটি মৃত্যুর জন্য সে-ই দায়ী।...হতাশা, ভয়ে সে কুঁকড়ে উঠলো। সে পাগলের মতো ছটফট করতে লাগলো। একটু শান্তির আশায় সে ক্যামডেনের বাড়ির চার দেওয়ালের মধ্যে নিজেকে বন্দী করলো। ভাবলো একটু স্বস্তি পেলো। ক-দিন ঘর থেকে বাইরে বেরোলো না। কেবল একই চিন্তায় ডুবে রইলো। ছুরিটা আলনার পেছনে লুকিয়ে রাখলো, তবু কি শান্তিতে থাকতে পারছে? এমনই যখন উথালপাথাল অবস্থা তখনই ভগবানের নির্দেশের মতো ফোনে কে যেন বললো, পালিয়ে যেতে। দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো পথে। কিন্তু কোথায় যাবে? তখন খেয়াল হলো, থানার উঠোনে এসে হাজির হয়েছে। অজানা আতঙ্কে তার শরীর কাঁপতে লাগলো, জ্ঞান হারিয়ে সেখানে পড়ে গেলো।

...তাকে থানায় প্রথম দিন দেখে আমার ধারণা হয়েছিল, এই লোকের পক্ষে খুন করা সম্ভব নয়, আততায়ী হতে পারে না। অবশ্য সে নিজের মুখে স্বীকার করেছে যে চারটি খুনের নায়ক সে নিজে। কিন্তু ওর স্বীকারোক্তি থেকে আমার যুক্তির বুনিয়াদ আরো মজবুত হলো।...

-ভারি তো যুক্তি, তার আবার বুনিয়াদ। ফ্রাঙ্কলিন তাচ্ছিল্যভাবে বললো।

–এ্যান্ডোভার এবং কার্স্টনের খুনের জন্য যে হাতিয়ার ব্যবহার করা হয়েছিল সেটি আমি বাইরের ঘরের আলমারিতে দেখেছি, যেদিন লেডি ক্লার্কের সঙ্গে দেখা করতে

গিয়েছিলাম।...আর সেদিন সিনেমা হলের দারোয়ান থেকে শুরু করে টিকিট চেকার–সবাই আপনাকে ছবি শেষ হওয়ার প্রায় দশ মিনিট আগে হল থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেছে। বেক্সহিলের মিলি হিগলি জিঞ্জার ক্যাটে বেটির সঙ্গে যাকে কথা বলতে দেখেছিল, সে আপনি স্বয়ং।...আর কাস্টের কাছে পাঠানো টাইপ রাইটার মেশিনে কম করে দশটা চাবিতে আপনার হাতের ছাপ পাওয়া গেছে।

-মঁসিয়ে পোয়ারো, চ্যালেঞ্জ করেছিলাম, আপনিই জিতলেন। এই বলে ফ্রাঙ্কলিন নিজের পকেট থেকে একটা রিভলবার বের করে নিজের কপাল লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপলো। কিন্তু রিভলবার থেকে কোনো গুলি বেরোলো না।

পোয়ারো হেসে উঠলো।

-মঁসিয়ে ফ্রাঙ্কলিন, আপনার হাতে ঐ যন্ত্র আর কাজ করবে না। আমার নতুন কাজের ছেলেটি সুযোগ বুঝে আগেই আপনার পকেট থেকে রিভলবার নিয়ে গুলি বের করে রেখেছে।

ফ্রাঙ্কলিনের আর কিছু করার নেই। সে রাগে উত্তেজিত হয়ে উঠলো। পোয়ারোকে গালমন্দ করতে লাগলো।

পোয়ারো হাসতে হাসতে বললো, মিঃ ফ্রাঙ্কলিন, নিজের মনকে কখনও ভুলেও ছোটো ভাববেন না।

পাশের ঘর থেকে ক্রোম, জ্যাক এসে ঢুকলো। ফ্রাঙ্কলিন লজ্জা অবনত মুখে দাঁড়িয়ে রইলো। তারা ফ্রাঙ্কলিনকে নিয়ে চলে গেল।

ঘরে নেমে এলো এক চরম নিস্তব্ধতা। একসময় মেগানের ফিসফিসানি শোনা গেল:..এতক্ষণ দুঃস্বপ্ন দেখছিলাম। বিশ্বাস হয় না। কিন্তু

–সব জানি আমি, মাদমোয়াজেল, আপনার মনের আশঙ্কাটা নিতান্তই অমূলক। মঁসিয়ে ফ্রেসার আর যাই করুক খুন করার মতো মানসিকতা তার নেই।

–তাহলে রাতের পর রাত আমি সেই স্বপ্নটা–ফ্রেসার বলে উঠলো।

–আসলে এটা একটা হৃদয় বদলের ব্যাপার। পোয়ারো ব্যাখ্যা করে বোঝাতে লাগলো। বেটি বার্নার্ডের মৃত্যুর পর সেই জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে ওর দিদি মেগান। তবে এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে আপনারা কেউ কাছাকাছি হতে পারেননি। সেগুলো স্বপ্নের আকারে প্রতিফলিত হয়েছে। তবে মঁসিয়ে ফ্রেসার, আপনাকে একটা কথা জানিয়ে রাখি, বেটি বার্নার্ডের পরিবর্তে যাকে আপনি আপনার মনের অন্তঃস্থলে স্থান দিয়েছেন তার সহযোগিতা আপনি সবসময় পাবেন, এটা আমার ধারণা।

লজ্জায় মেগান ও ফ্রেসারের মুখ রাঙা হয়ে উঠলো।

এবার সুযোগ বুঝে আমি জানতে চাইলাম, আচ্ছা পোয়ারো, সেদিন ইস্টবোনের হোটেলে বসে এমন অদ্ভুত খেলা খেললে কেন?

–আমি প্রত্যেককে প্রশ্ন করার মাধ্যমে মাদমোয়াজেল গ্রে-র উত্তরের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলোম। এই ফাঁকে মঁসিয়ে ফ্রাঙ্কলিনের মনের ইচ্ছা বুঝে নেওয়া যাবে। এটাই ছিল আমার প্রধান উদ্দেশ্য।

-সত্যি, আপনি সেদিন কি প্রশ্নটাই না করেছিলেন..থরা মিস্টি রেগে পোয়ারোকে বলল।

–হ্যাঁ, আপনিও সঠিক জবাব দেননি।

-টাইপ মেশিনের বোতামে যে আঙুলের ছাপের কথা বললে, আমি কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইলাম।

–এই কথাটা কেন বলেছিলাম জানো? তোমার মনকে সন্তুষ্ট করার জন্য। আসলে সমস্ত মেশিন খুঁজেও কোনো আঙুলের ছাপ পাওয়া যায়নি।

এরপর চারদিন কেটে গেল।

–এ অবস্থায় আমার কি করা উচিত? কাস্ট সরাসরি পোয়ারোর দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি যে কাগজের প্রস্তাবটা দিয়েছিলেন...আমার জীবনী ও ইতিহাস তারা ছাপবে...বিনিময়ে আমি পাবো একশো পাউন্ড...বলুন তো, আমার কি করা ঠিক?

আপনি ওদেরকে জানিয়ে দিন যে আপনার জীবনী কাগজে প্রকাশ করতে হলে পাঁচশো পাউন্ড আপনাকে দিতে হবে। এর একটা পয়সা কম হলে আপনি রাজি হবেন না। আপনার মতো এমন বিখ্যাত মানুষ সারা ইংল্যান্ডে দ্বিতীয় কেউ নেই।

আনন্দে কাস্টের চোখে জল এসে গেল–হ্যাঁ, আজ যদি আমার মা জীবিত থাকতেন..আর হ্যাঁ, লিলির মতো মেয়ে হয় না। এই বিয়ের যৌতুক হিসাবে ওকে আমি একটা আংটি উপহার দেবো।

-খুব ভালো হবে। তবে নিজের চোখের চিকিৎসার কথা ভুলবেন না। এতে আপনার মাথার যন্ত্রণা কিছুটা কমতে পারে।

-মনে থাকবে।

তারপর কাস্টের থেকে বিদায় নিলাম।

পোয়ারো বললো, ভবিষ্যতে কোনোদিন আমাদের হয়তো দেখা হবে, আজ আসি। আমরা সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হলাম।